তালাল আসাদ
পথ জানা নেই

ফাহমিদ-উর-রহমান

আরজ

তালাল আসাদের জন্ম : ১৯৩২ সালে সউদি আরবে। তার সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি। আলাপও হয়নি। সে সুযোগও কখনো আসেনি। আমি অ্যাকাডেমিয়ার মানুষ নই। নিতান্তই একজন পাঠক। তার সাথে দেখা হলে কী বলতে পারতাম, তারই কিছুটা হয়তো এ বইয়ে হাজির করার চেষ্টা করেছি। বলা চলে এ বই আমার একটা পাঠ প্রতিক্রিয়া। এ বই তার সাথে একটা বোঝাপড়ার ফল। কিন্তু বোঝাপড়াটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত। নীরবে নিজের মধ্যে আমি তার সাথে একটা সংলাপে যুক্ত হয়েছি। এ সংলাপের সময় তার লেখাপত্রই আমার সাথে কথা বলেছে। শিল্পী যেমন নিজের সৃষ্টির আনন্দে নিজেই মেতে ওঠেন, এটা অনেকটা তেমন ঘটনা। তালালের মতো একজন বুদ্ধিজীবীর সাথে কথা বলা অবশ্যই স্বস্তি ও আনন্দের। তালালের সাথে এটা ছিল আমার এক আনন্দ উচ্ছ্বসিত চিন্তার সফর। তার সাথে আমার এ সফরে অনেক জায়গায় পথ পৃথক হলেও যেন বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি।

তালাল আসাদের নামের সাথে আমার প্রথম পরিচয় তার আব্বা মুহম্মদ আসাদের (১৯০০-১৯৯২) সূত্রে। আসাদের দুনিয়া কাঁপানো বই *মক্কার পথ* পড়ে এতখানি শিহরিত হয়েছিলাম যে, এ বইয়ের অনুবাদক কথাশিল্পী শাহেদ আলীর সাথে আমি দেখা করতে যাই। তার বাসার সামনে ছিল একটা শিউলী ফুলের গাছ। সেই ফুলের সৌরভ, শাহেদ আলীর শরাফতি, আর *মক্কার পথ* পড়ার তাজা অনুভূতি এখনো আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে। তার কাছে প্রথম আমি তালালের কথা শুনতে পাই।

মুহম্মদ আসাদ আমাদের দেশে কম-বেশি আলোচিত। বিশেষ করে তার ইসলামি রাষ্ট্র চিন্তার দিকটা আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীকে একসময় আকর্ষণ করেছিল। কাকতালীয় কিনা জানি না, আসাদের পুত্র তালাল পিতার ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণাকে সমর্থন করেননি। এ কারণে এদেশে যারা ইসলামি রাজনীতিকে অপ্রীতির চোখে দেখেন, তারা

তালালকে চর্চা শুরু করেন। তালাল চান আর না চান, রাজনীতির চরিত্রের কারণেই পিতা-পুত্র আমাদের এখানে এখন বাইনারি চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

বাংলাদেশে এখন তালালচর্চা কিছুটা জমে উঠেছে। বেশ কিছুদিন আগে এই নবীন তালাল চর্চাকারীদের একজন আমাকে কথাসূত্রে বলেছিল, 'আপনি তো মুহম্মদ আসাদের লেখা পড়েছেন। এখন তার ছেলে তালালের একটা বই পড়েন।' এই কথা বলে সে-ই আমাকে তালালের *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* বইটার একটা ফটোকপি পড়তে দেয়। বইটার ভেতরে কলম দিয়ে দাগানো, লাইনের নিচে দাগ কাটা, আর মার্জিনে মন্তব্য লেখা। বুঝতে পারলাম এর আগে যে বইটা পড়েছে, সে খুব সিরিয়াস পাঠক। বেশ কিছুদিন ধরে বইটা আমি নিজের কাছে রেখেছি। নাড়াচাড়া করেছি। সিরিয়াসভাবে না হলেও শিথিলভাবে শেষ পর্যন্ত বইটা পড়ে শেষ করি। স্বীকার করতে অসুবিধা নেই, তালালের প্রথম বইটা পড়তে আমার বেশ কষ্ট হয়েছে। এর কারণ, তালালের লেখার ভঙ্গি। তার গদ্য বেশ জটিল। অনেকসময় কিছুটা দুর্বোধ্য। উত্তর-আধুনিক পণ্ডিতদের মতো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলেন তিনি। পিতা আসাদের লেখার সাহিত্যরস, সাবলীলতা, নির্মেদ বর্ণনাভঙ্গি তালালের ভেতরে অনুপস্থিত। তালালের ভঙ্গিটা গবেষকের অবশ্যই, তবে তা উত্তর-আধুনিক ছাঁচে ঢালা। তখনই বুঝতে পারি তালাল ঠিক তার পিতার মতো নন। পশ্চিমের জ্ঞানসমুদ্র তিনি মন্থন করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংশয়ী রয়ে গেছেন। সব বিষয়েই তার প্রশ্ন আর প্রশ্ন। দুই দশক আগের আমার এই তালালচর্চা বেশিদূর এগোয়নি।

২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর হঠাৎ দেখি তালাল আবার উঠে এসেছেন। সেই নবীন বন্ধুর দল যারা আমাকে বহুবছর আগে তালালের বই পাঠ করতে দিয়েছিলেন, তারা এখন অনেকেই ক্ষমতাকেন্দ্রে পৌঁছেছেন। এটা আমার কাছে বেশ গোলকধাঁধার মতো লাগে। এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সংস্কার, তালালের বাইনারি ভাঙ্গার তত্ত্ব, ট্র্যাডিশনকে উন্মুক্ত করার ভাবনা, বঙ্গীয় ইসলামের সমন্বয়বাদী আলাপ, ভাসানীর পালনবাদ প্রভৃতি আইডিয়া উঠে আসে। তাত্ত্বিকভাবে এসব আইডিয়া শ্রুতিমধুর হলেও, এটা কোনো পরীক্ষিত বিষয় নয়। এর বাস্তবায়ন এখনো প্রমাণসাপেক্ষ। এই

পটভূমিতে আমি নতুন করে তালালের সাথে সফর শুরু করি। এই সফরের অভিজ্ঞতাটাই এ বইতে আমি লিখেছি।

তালালের সাথে তার পিতার পার্থক্য প্রধানত চিন্তা ও আদর্শের জায়গায়। তালাল তার পিতার বায়োলজিক্যাল সন্তান, ইডিওলজিক্যাল সন্তান নন। এই তফাৎটা তৈরি হয়েছে জীবনদৃষ্টির ভিন্নতার কারণে। তালালের পিতা মুহম্মদ আসাদের জীবনদৃষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বিত এক কল্যাণভাবনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। কুরআনে যাকে বলা হয়েছে হাসানাহ। তিনি এই পটভূমি সামনে রেখেই মানুষের মুক্তির মেনিফেস্টো তৈরি করেন। তালালের চিন্তা একান্তই দুনিয়াকেন্দ্রিক। পোশাকি ভাষায় যেটাকে আমরা বলি সেকুলার। কিন্তু তালালের সেকুলার চিন্তাটা গতানুগতিক নয়। বলা চলে পর্যালোচনামূলক। সেকুলারিজমের ক্ষতগুলো সারিয়ে তিনি এর একটি মোলায়েম চেহারা দেওয়ার পক্ষপাতী। এজন্য কেউ কেউ তাকে সংশোধনবাদী সেকুলারও বলেছেন।

তালাল তার পিতার রাজনৈতিক ইসলাম নিয়ে বেশ সমালোচনামুখর। রাজনৈতিক ইসলামের জন্ম মুসলিম সমাজে ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসী প্রক্রিয়ার ভেতর। আধুনিকতা যেভাবে মুসলিম সমাজকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিতে উদ্যত হয়েছে, সেই তৎপরতাকে মোকাবিলার জন্যই রাজনৈতিক ইসলামের জন্ম। এটা ইউরোপের আগ্রাসী রূপের সামনে মুসলিম সমাজের একটা অর্গানিক বা দেশজ প্রতিবাদ। মার্কস পড়া তালাল আসাদ রাজনৈতিক ইসলামের এই জিনিওলজিটা ধরতে পারেননি।

তালালের বাইনারি ভাঙ্গার চিন্তাটা তার হেগেল ও দেরিদা পড়ার ফল বলেই মনে করা যায়। হেগেল চিন্তার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন নয়-প্রতিনয়-সমন্বয় (Thesis—Anti-Thesis—Synthesis) হিসেবে। তালালও বাইনারি ভেঙ্গে এরকম সমন্বয়তা— সংকরতার দিকে কিছুটা ইঙ্গিত দেন। অন্যদিকে দেরিদার বাইনারি ভাঙ্গার প্রস্তাবনা তো তালালের লেখালেখিতে বিপুলভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু এসব চিন্তাভাবনা তত্ত্বের বাইরে কতটুকু বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য— সেটাও আমাদের ভাবা দরকার। তত্ত্ব ভাঙচুরের খেলাধুলার শেষে তত্ত্বের ঊর্ধ্বে তত্ত্বহীনতার যে বয়ান হাজির করা হচ্ছে, তা তো এক ধরনের উদ্দেশ্যহীনতা। উদ্দেশ্যহীনতা নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। এরকম

উদ্দেশ্যহীনতা মানুষের কাম্য নয় মোটেই। অন্যদিকে সমন্বয়ভাবনাটা কখনো কখনো হিতে বিপরীত হতে পারে। আমাদের উপমহাদেশেও তার নজির আছে। আকবর, কবির, দাদু, এমনকি আমাদের লালন প্রমুখ সমন্বয়ের কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এগুলো ধোপে টেকেনি। সমন্বয়ের চেয়ে সহাবস্থান বেশি বাস্তবসম্মত।

মার্কস বিখ্যাত হয়েছেন পুঁজির সমালোচনা ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রভাবনার জন্য। ইতিহাসের রায়ে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ধারণাটা পরিত্যক্ত হলেও মার্কস যেভাবে পুঁজির সমালোচনা করেছেন, সেটিকে অনেকেই আজও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তেমনি তালালও সেকুলারিজমের যে সমালোচনা করেছেন, তা খুবই মূল্যবান। মার্কস ও তালাল তাদের এই সমালোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই। তবে তালালের সেকুলারিজমের সমালোচনা পদ্ধতি, বাইনারি উল্টে দেওয়ার ভাবনা প্রভৃতির উদ্দেশ্য কিন্তু সেকুলারিজম ত্যাগ করা নয়। বরং, সেকুলারিজমের মনোলিথিক— একরৈখিক চরিত্র সংস্কার করে জনপরিসরে এর একটি ঘাতসহ, বহুত্ববাদী স্পেস তৈরি করা, যেখানে নানা মতের মানুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেকুলারিজমের সনাতন ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে এই ধরনের নতুন তত্ত্বায়ন একদিক দিয়ে নিও-লিবারেলিজমের রাজনীতিকে সমর্থন করে। নিও-লিবারেলিজমের রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে লিবারেলিজমকে তার সংকট থেকে উদ্ধার করা।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে যে রক্তাক্ত রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, তাকে এক ধরনের নিও-লিবারেল রেজিম চেঞ্জ বলা যায়। যদিও দেশের মানুষ সনাতন সেকুলারবাদীদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় বেইনসাফির অবসানের জন্য জীবন দিয়ে এ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তনের সুফল নিও-লিবারেলপন্থিদের হাতে হস্তগত হয়। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমা শক্তি বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমা মদদপ্রাপ্ত এনজিওগুলো বিপ্লবে ব্যর্থ বামপন্থিদের রিক্রুট করে। এদের সহায়তায় এনজিওগুলো এখানে একটা নন-স্টেট অর্থনৈতিক উন্নয়ন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এটাকেই অনেকে বলছেন সামাজিক ব্যবসা। এই বিকল্প উন্নয়ন অর্থনীতির নেতাকর্মীরা এদেশে এতকালের পেটি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়া লুটেরা অর্থনীতির জায়গায় নিও-লিবারেল অর্থনীতি

চালু করতে চাচ্ছে। আর এই নিও-লিবারেল অর্থনীতির রাজনীতিকে বলা হচ্ছে নয়া বন্দোবস্ত। এ কারণেই রেজিম চেঞ্জের পর পশ্চিমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এনজিওপন্থি ও সাবেক বামপন্থিদের একটা অংশের এ সরকারে ভালোমতো পুনর্বাসন হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে তারা সনাতন সেকুলারপন্থিদের নিপীড়ন কাঠামোর মধ্যে থাকা পরিবর্তনকামী শিক্ষিত তরুণদের একটা অংশকে খুব সফলভাবে রিক্রুট করেছে। এদেরকে জেন-জি বলা হচ্ছে। এখন পরিবর্তনকামী অন্যান্য মতের লোকজনদের কিছু কিছু জায়গা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। নিও-লিবারেলিজমের এই নয়া বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আঞ্চলিক পরাশক্তি রাষ্ট্রটি ও সনাতন লিবারাল-সেকুলার ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রেণি ও রাজনৈতিক নেতারা। এই দ্বন্দ্বে দেশের সাধারণ জনগণের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো।

এখন নিও-লিবারেলিজম এদেশে যে ব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছে, সেটা কি এদেশে আদতেই দুর্নীতিমুক্ত, মেধাভিত্তিক কোনো ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারবে? পরাশক্তি যখন নিজস্ব ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে একটি রক্তাক্ত পরিবর্তনের নেপথ্য নায়ক হয়, তখন জনগণের প্রকাশ্য দাবিদাওয়া পূরণ হওয়া কঠিন বৈকি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এর নজির আছে।

যাহোক, নিও-লিবারেলিজমের এদেশীয় সহচররা তাদের রাজনীতির তাত্ত্বিক প্রয়োজনে তালাল আসাদকে নিয়ে এসেছেন এবং বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এভাবে তালাল নতুন করে নিও-লিবারেলিজমের রাজনীতির সাথে সখ্যতা স্থাপন করেছেন। আর এভাবেই আমি আমার সেই নবীন বন্ধুর (বর্তমানে নবীনতা অতিক্রান্ত, প্রৌঢ়তা ছুঁই ছুঁই) তালাল চর্চার গূঢ় তাৎপর্য অনুভব করি।

বাংলাদেশের এই তালাল চর্চাকারীদের আরেকটা ঝোঁক হচ্ছে তালালের ট্র্যাডিশন বিষয়ক আলাপসমগ্র। এসব আলাপের সূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্তব্য করেন এবং দেখান— ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য একটা পরিবর্তনশীল বিষয়। এর সাথে বাইরের অন্য ট্র্যাডিশন যুক্ত হলেও সমস্যা নেই। এই ঐতিহ্যের ভেতরে নানা রকম তর্ক-বিতর্কের ধারা আছে। এই তর্ক-বিতর্কগুলো ওঠার পেছনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার বিভাজনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, ক্ষমতার ঘাত-প্রতিঘাতের

কারণে মানুষের জীবনযাপনের রীতি বদলায়। তালাল এখানে মন্তব্য করেন, মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাচরণের রীতিগুলো বদলাতে হলে আধুনিকতাবাদীদের মতো ধর্মের বাইরে থেকে সমালোচনা না করে ধর্মের ভিতরকার চলা বিতর্কে শামিল হতে হবে। এই নতুন তালাল চর্চাকারীর দল এ পথেই এগুচ্ছেন বলে মনে হয়।

এসব তালাল চর্চাকারীরা এখন ইসলামের ঐতিহ্যের ভেতরে প্রবেশ করে ঐতিহ্যের ভেতরকার তর্ক-বিতর্ককে উসকে দিয়ে ইসলামি চাদরে ঢেকে ইসলামকে একটি ইহলৌকিক ধর্মে পরিণত করতে চান। অথচ নিজেদের সেকুলার পরিচয় দিতে আপত্তি করেন। হয়তো রাজনৈতিক কৌশলের কারণে এমনটা হয়। ইসলামের ঐতিহ্যের ভেতরে তর্ক-বিতর্কের একটা সিলসিলা আছে সত্য। এর ভেতর দিয়ে মুসলিম সমাজ-সভ্যতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু ইসলামি ঐতিহ্যের একটা মার্জিন আছে। ইতিহাসে তর্ক-বিতর্কগুলো এই মার্জিনের ভেতরে থেকেই হয়েছে। মার্জিনকে অতিক্রম করলে সেটা আর ইসলামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কারো ব্যক্তিগত ভাষ্য, তা যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না ইসলামের এই মার্জিন দ্বারা সুচিহ্নিত না হয়। আমাদের চোখের সামনে কাদিয়ানি ধর্মের উদাহরণ আছে। এদের তর্ক-বিতর্কের পরিসর ইসলামের এই মার্জিন অতিক্রম করেছে বলে এরা মুসলিম সমাজের ভেতরে ঠাঁই পায়নি।

বাংলাদেশের লালনবাদটাও অনেকটা তাই। এজন্য আলেমরা এদেরকে চিরকাল বে-শরা মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। লালনবাদী চিন্তাভাবনাটা ইহলৌকিকবাদী, গুরুবাদী, কিছুটা এসোটারিক—রহস্যবাদী। এদের চিন্তাভাবনা গুরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গুরুতেই শুরু, গুরুতেই শেষ। অন্যদিকে লালনের দেহতত্ত্ব পুরোটাই দুনিয়াবি দেহনির্ভর। দেহের বাইরে আর কিছু নেই। এসব গুরুবাহুল্য, দেহবাদী চিন্তাভাবনা শেষ পর্যন্ত নৈতিক নৈরাজ্য ছাড়া তেমন কিছু দিতে পারেনি। ঔপনিবেশিক আমলে ইসলামের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সাথে এই ধরনের সমন্বয়মূলক ভাষ্য ইসলামি তর্ক-বিতর্কের পরিসরে ঢুকতে চেয়েছে বটে, কিন্তু ইসলামি ঐতিহ্যের মার্জিনের বাইরে একটা বহিরাগত চিন্তা হিসেবে রয়ে গেছে। কাদিয়ানি ধর্মের মতো লালন ধর্মের একই পরিণতি হয়েছে।

লালন নিয়ে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, এদেশের তালাল চর্চাকারীরা লালনের ভাবনাকে ইসলামি ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখাতে উদগ্রীব। মুখে সরাসরি না বললেও কাজে সেটাই দেখা যায়। এভাবে তালাল হয়তো না চাইলেও বাংলাদেশে এসে তার শিষ্যকুলের উদ্ভাবনী শক্তির জোরে লালনের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

এ বই লেখার সময় আমি দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের অনেক গবেষক, ভাবুক ও গুণীজনদের সাথে কথাবার্তা বলেছি, মত বিনিময় করেছি। তাদের সাথে আলোচনা তালাল সম্পর্কে আমার বোঝাপড়াকে অনেক বিষয়ে পরিচ্ছন্ন করেছে। এদের মধ্যে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক আহমদ শাব্বীর, তুরস্কের ইবন খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক তোহা সেলিম ও মাহমুদ নাঈম, ব্যাংকার আদনান মাসরুর, করটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরেজির শিক্ষক জগলুল আসাদ এবং চিন্তক ও রাজনীতি বিশ্লেষক তরিকুল হুদার নাম বিশেষভাবে বলতে হবে। তালালের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যটনের সময় এরা সবসময় আমাকে সাহচর্য দিয়েছে। বিশেষ করে তরুণ তত্ত্ববিদ জগলুল আসাদ বইটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমাকে মূল্যবান মতামত দিয়েছে। এছাড়াও বইটি লেখায় আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে সুহৃদ ব্যাংকার মো. হাবিবুর রহমান। তাদের সবাইকে জানাই মোবারকবাদ।

এ বইয়ের প্রকাশক বুকমাস্টারের আহমদ হোসেন মানিক, যাকে প্রচলিত অর্থে প্রকাশকের চেয়ে একজন তত্ত্বজ্ঞানী বলাই যথার্থ। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও উদ্দীপনার সাথে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বুকমাস্টার ক্রমশ চিন্তাশীল লেখক-পাঠকের আস্থাভাজন হয়ে উঠছে। বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বুকমাস্টার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই।

ফাহমিদ-উর-রহমান

আগস্ট ২০২৫

Boier Somahar

Click here

to join our Telegram Channel

The limits of my language mean the limits of my world.

— Ludwig Wittgenstein

তালাল আসাদ
পথ জানা নেই

এক.

তালাল আসাদ আমাদের সময়ের একজন শক্তিশালী নৃতাত্ত্বিক ও পণ্ডিত। তার পিতা বিশ্ববিশ্রুত ইসলামবিদ মুহম্মদ আসাদ। পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত— প্রজন্মান্তরে ইলমের এই সিলসিলাটা দেখতে ও ভাবতে ভালোই লাগে। তবে তালালের ভাবনার জগতটা ঠিক আসাদের মতো নয়। আসাদের ভাবনার জগতের কেন্দ্রে ছিল ইসলাম। অন্যদিকে তালালের ভাববিশ্ব তৈরি হয়েছে পশ্চিমের চিন্তাকাঠামো দিয়ে। *মক্কার পথ* বইয়ে তালাল সম্বন্ধে আসাদ লিখেছিলেন :

> ... পুত্র তালাল, যে মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের ঘরে জন্মেছে তাকে পেয়ে আমি অনুভব করতে শুরু করেছি যে আরবেরা একাধারে আমার স্বজন এবং আদর্শিক ভাই। আমি চাই যে তালাল দেশের গভীরে তার শিকড় গাড়ুক এবং রক্ত ও তমদ্দুনের যে মহৎ উত্তরাধিকার তার রয়েছে তারি উপলব্ধির মধ্যে সে বেড়ে উঠুক।[১]

বাস্তবে অবশ্য তা হয়নি। আসাদের স্বপ্ন কতকটা ভঙ্গ হয়েছিল। মায়ের সূত্রে তালাল ছিলেন আরব। অবিভক্ত ভারত, পরে পাকিস্তানে তার বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা করেছেন পশ্চিমে এবং পরে সেখানেই থিতু হয়েছেন। তার কথাবার্তা, চালচলন, ব্যবহার, জীবনযাপন দেখে একজন পশ্চিমা সাহেবই মনে হয়। তার বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তার চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছিল, সন্দেহ নেই।

পাকিস্তানে মিশনারি স্কুলে পড়তেন। ওভামির আনজুমের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন পনেরো বছর বয়সে তিনি বিশ্বাস হারান। পাকিস্তান তার কাছে ভালো লাগেনি। কারণ, সেখানে তিনি

চিন্তার স্থবিরতা দেখে হাঁপিয়ে ওঠেন। সেই বয়সেই তার আব্বার সাথে মতভিন্নতা শুরু হয়। তিনি তার আব্বার সাথে ইসলামি রাষ্ট্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন।[২]

পশ্চিম নিয়ে তার এক ধরনের মুগ্ধতা তৈরি হয়েছিল। সেখানকার মুক্তচিন্তা, যুক্তিশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক-বিতর্ক, সংস্কারহীনতা তাকে খুব টেনেছিল। কিন্তু বিলাতে পড়তে এসে দেখেন এরাও খুব সংস্কারাচ্ছন্ন। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে আরবদের হারে ইংরেজদের বাছ-বিচারহীন উল্লাস দেখে তিনি রীতিমতো ট্রমার ভেতরে পড়ে যান। যুক্তির রাজনীতি মুক্তির দিশা দিতে পারে— এজাতীয় ধারণার প্রতি তার সংশয় বাড়ে। পশ্চিম নিয়ে এভাবে তার মোহভঙ্গের শুরু।

এই মোহভঙ্গ থেকে তিনি মার্কসবাদের দিকে হাঁটা শুরু করেন। তার কাছে মনে হয় মার্কসবাদই যথার্থভাবে উদারনৈতিকতার অসংগতিগুলোকে তুলে ধরতে পারে। এভাবে তিনি বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েন, কিছুটা অ্যাক্টিভিজমও করেন। বাম ঘরানার পাঠচক্র ও পত্রপত্রিকার সাথে ঘনিষ্ঠ হন এবং নবীন শিক্ষক হিসেবে পদ্ধতিমাফিক মার্কস পড়ান। তার ভাষায় :

> আমি তখন রাজনৈতিকভাবে বাম ঘরানার প্রতি নিবেদিত। মার্কস পড়ি, একটা *ক্যাপিটাল*-পাঠচক্রের সাথে যুক্ত, ঈমানদার বান্দারা যেভাবে বাইবেল পড়ে, সেভাবে ক্যাপিটালের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছি। পেনসিলে দাগানো, লাইনের নিচে দাগ কাটা, আর মার্জিনে মন্তব্যসহ সেই পুরোনো বই আজো আমার কাছে আছে। আসলে ষাটের দশকের শেষের দিকে আমরা কয়েকজন আলথুসারীয় মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিলাম।[৩]

তালাল ছিলেন বুভুক্ষু পাঠক। বিচিত্র বিষয়ে ছিল তার আগ্রহ। এই বিপুল অধ্যয়ন তাকে জ্ঞানশাস্ত্রের নানা বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক চিন্তাভাবনার জন্য প্রস্তুত করেছিল। তিনি একজন উঁচু মাপের সমালোচক। জ্ঞানশাস্ত্রের প্রত্যেকটি স্তর ধরে ধরে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি আইডিয়ার খুঁত বের করেন। অ্যাকাডেমিক তর্কাতর্কিতে তার কোনো জুড়ি নেই। তার লেখা ও বক্তব্য বোঝা সহজ নয়। এর

মধ্যে তার চিন্তার সূক্ষ্ম জটিলতা চোখে পড়ে। তিনি সোজাসাপ্টা কথা বলেন না। ঘুরিয়ে বলেন। একদিক দিয়ে যুক্তি শুরু করে উল্টো দিক দিয়ে তা শেষ করেন। এজন্যই তার বক্তব্যকে মনে হয় অ্যামবিগিউয়াস— অস্পষ্ট। অনেকবার পড়লে বা অনেকদিন মাথায় ঘুরপাক খেলে আস্তে আস্তে তা খোলাসা হয়। তালালের লেখার এ জটিলতার কথা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।

তালাল তার পঠন-পাঠন ও নানারকম জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার ভেতর দিয়ে একসময় সিদ্ধান্তে আসেন মার্কসবাদ ও উদারনীতিবাদের ভেতরে তফাৎ থাকলেও আলোকায়ন ঐতিহ্যের অনেক বৈশিষ্ট্য এ-দুটোর ভেতরে আছে। যার ফলে মার্কসবাদের প্রতি তার এক ধরনের বিরাগ তৈরি হয়। এভাবে তার কাছে মনে হয় উদারনীতিকরা যা দাবি করে থাকে, বাস্তবে তা অনেককিছুই সত্য হয় না বা তারা তেমন নয়। অন্যদিকে মার্কসবাদীরা সবাইকে মুক্ত করার কথা বললেও তা তারা সেভাবে পালন করে না। তবে মার্কসবাদ ও উদারনীতিবাদ দুটো ধারাই তার চিন্তাকাঠামোর বুনিয়াদ নির্মাণ করেছে। এদের চিন্তা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, জীবনযাপন অনেকক্ষেত্রেই তার জীবনের অংশ হয়ে আছে। বিশেষ করে মার্কসের লেখালেখি তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। মার্কসের প্রতি তার শ্রদ্ধাও অপরিসীম।

তালাল হলেন সেরকম পণ্ডিত, যিনি শুধু একটামাত্র তত্ত্ব নিয়ে বসে থাকেননি। তত্ত্বের পর তত্ত্ব তিনি পার হয়ে গেছেন। দেখা গেল, তিনি শুরু করলেন একটা তত্ত্ব দিয়ে। কিন্তু সেই চিন্তা অতিক্রম করলেন। একটা পর্যায়ে তিনি একটামাত্র চিন্তাকে কবুল করেন। পরে সেটিকে সমালোচনা করেন। এভাবে তিনি প্রত্যেকবার নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌছান।

প্রথম দিককার লেখালেখিতে মার্কসের বদৌলতে তিনি ঔপনিবেশিক শাসক, নৃতাত্ত্বিক ও কাবাবিশ জনগোষ্ঠী (বর্তমান সুদানের উত্তর কর্ডোফান অঞ্চলের যাযাবর গোত্র, যারা সুন্নি মুসলিম এবং যাদের পূর্বপুরুষ আরব)— সবাইকে সমালোচনা করার এক দৃষ্টিভঙ্গি হাসিল করেন। *দ্য কাবাবিশ অ্যারাবস* (১৯৭০) ছিল তার নৃ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রন্থ। এখানে তিনি নৃ-বিজ্ঞানে প্রচলিত তখনকার প্রতিষ্ঠিত ভাবধারাগুলোকে সমালোচনা করেছিলেন। পরে তিনি তার সম্পাদিত

গ্রন্থ *অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল এনকাউন্টার* (১৯৭৩) কিতাবে উপনিবেশের সাথে নৃ-বিদ্যার ক্ষমতা-সম্পর্কের গঠন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদ-উত্তর পর্যায়ে তার লেখালেখি এগিয়েছে আধুনিকতা, ঐতিহ্য, ধর্ম, সেকুলারিজম— এসব ধারায়। এভাবে তিনি আগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা সরে আসেন এবং পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করান। এ পর্যায়ে তিনি লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের অ-নির্যাসবাদী, মিশেল ফুকোর জিনিওলজিক্যাল ও দেরিদার উত্তর-কাঠামোবাদী চিন্তাপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন। এরপর থেকে তার লেখালেখিতে এসব পদ্ধতির প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

অ-নির্যাসবাদী পদ্ধতি হলো একক বৈশিষ্ট্য দিয়ে সবকিছুর বিচার না করা, কোনো চিন্তাভাবনাকে অর্থের দিক দিয়ে নির্দিষ্ট না করে পরিবর্তনশীল করে তোলা। উত্তর-কাঠামোবাদ হলো স্থির অর্থকে প্রত্যাখ্যান, বাইনারি ভাঙ্গা, চিন্তার অন্তর্গত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার উন্মোচন এবং মহাবয়ানকে প্রশ্ন করা।

জিনিওলজি বা কুলজি পদ্ধতি হলো জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক যাচাই করা, ক্ষমতার সম্পর্কে কীভাবে জ্ঞান উৎপাদন হয়, তা পর্যবেক্ষণ; প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে ভাঙ্গা, ধারণার পিছনে লুকায়িত শক্তি দেখা এবং বর্তমানের সাথে বিশ্বাস, চর্চা ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক মূল্যায়ন করা।

তালালের সামগ্রিক চিন্তা ও চর্চায় এ বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত। আবার অনেকের সাথে এসব প্রণবতার তিনি নির্মাতাও। ফলে দেখা যায়, তার চিন্তাভাবনার মধ্যে নানা মতের মিশ্রণ ঘটেছে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি কখনো থিতু হননি এবং সংশয় নিয়ে চিন্তা থেকে চিন্তায় তিনি পর্যটন করেছেন। মতাদর্শিক জায়গা থেকে তার কোনো সুচিন্তিত অবস্থান দেখা যায় না। সমাধান দেওয়ার মতো পণ্ডিত তিনি নন। স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের মতো বড়ো বড়ো সমস্যার জায়গায় তিনি অনেকটা অস্পষ্ট থাকেন। মুক্তিকামী মানুষের কর্তসত্তা বিষয়ে তিনি কিছুটা নিরাসক্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা সমালোচকও। বন্ধু এডওয়ার্ড সাঈদের ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সাপেক্ষে পশ্চিম প্রসঙ্গে তার অবস্থান তালালের পছন্দ হয়নি।[৪]

পুঁজিবাদী পশ্চিম অনেক শক্তিশালী। পশ্চিমের প্রবল প্রতাপের সামনে অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর মুক্তির সম্ভাবনা অনেক কঠিন হয়ে গেছে— এটা তিনি জানেন। কিন্তু ওই লক্ষ্যে কিছু করা দরকার— এ নিয়ে তার আগ্রহ নেই। এ বাস্তবতার ভেতরেও সারা দুনিয়ার মানুষ নানাভাবে তাদের উদ্যোগ-তৎপরতা চালায়। কিন্তু তালালের কাছে এসব তৎপরতার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। এক্ষেত্রে পশ্চিমের ব্যাপারে তিনি নমনীয়। সেদিক দিয়ে পশ্চিমের স্থিতাবস্থা তিনি এক অর্থে মেনে নেন বলা যায়। তার এই মেনে নেয়াটা, নীরব থাকাটা নিও-লিবারেলিজমের স্বার্থের দেখভাল করে কিনা— অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও সেসব ভাবনা তো মাথায় চলে আসে। এক্ষেত্রে তালালের বড়ো হয়ে ওঠা, দৈনন্দিন জীবনযাপন, পশ্চিমের সাথে তার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক— এসবের কিছু না কিছু ভূমিকা তো আছে। তালাল সারা জীবন সব মত ও পথকে বর্গায়ন করেছেন, সমালোচনা করেছেন, এর খুঁত ধরেছেন। তালালকে কি কোনো বর্গের মধ্যে আটকানো যায়? উত্তর-মার্কসবাদী, উত্তর-সেকুলারবাদী, উত্তর-কাঠামোবাদী, অ-নির্যাসবাদী, জিনিওলজিস্ট, উত্তর-ইসলামবাদী, উত্তর-মতাদর্শবাদী— হয়তো সবগুলো তার চিন্তাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

দুই.

তালাল আসাদের লেখালেখিতে বার বার ধর্ম, ঐতিহ্য, আধুনিকতা, সেকুলারিজম বর্গগুলো আলোচিত হয়েছে। তালালের মতে ধর্মের কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা হয় না।[৫] কারণ, সময়ের সাথে সাথে ধর্মের সংজ্ঞাও বদলায়। জীবনযাত্রার ধরণ পাল্টালে বিশ্বাসের ধরণও পাল্টে যায়। ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া মানে একটা অসম্ভব সমগ্রতাকে ধারণ করার চেষ্টা করা।

তালালের মত হলো ধর্ম আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাক-আধুনিক কালে ধর্ম নামে কিছু ছিল না। যেমন— প্রাক-আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। ধর্মকে তিনি কখনো কনসেপ্ট, কখনো ট্র্যাডিশন, কখনো ইডিওলজি আকারে দেখেছেন। তিনি মার্কসবাদ বা সেকুলারিজমকেও একইভাবে দেখেছেন।

ধর্মকে তালাল ঠিক বিশ্বাসের জায়গা থেকে দেখেননি। তিনি দেখেছেন ধর্মের আচারের জায়গা থেকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ভেতরে ধর্ম যেভাবে বিরাজ করে, সেভাবে তিনি ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এদিক দিয়ে দেখলে তিনি আচারকেন্দ্রিক ধার্মিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন— নৃতাত্ত্বিকরা যেটা করে থাকেন।

একজন ধার্মিক মানুষ সাধারণত বিশ্বাসের জায়গা থেকে ধর্মকে বোঝাপড়ার চেষ্টা করে এবং বিশ্বাসের জায়গা থেকে সে ধর্মীয় আচারগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু তালাল আচারের জায়গা থেকে বিশ্বাসে পৌঁছান। তালালের এ প্রবণতাটা ঠিক ধর্মের দিকে যায় না। বরং, সেকুলারিজমের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে প্রসারিত হয়।

তালাল ধর্মকে ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য হিসেবে দেখেন। ট্র্যাডিশন হলো কতকগুলো ডিসকোর্সের সমষ্টি, যা চর্চাকারীকে চর্চার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে ধারণা দিয়ে থাকে। ডিসকোর্স মানে হচ্ছে বাক্য, চিন্তা, জ্ঞান। শুধু তাই নয়, এটা একটা কাঠামোগত চিন্তা বা জ্ঞান। তালাল দেখানোর চেষ্টা করেন ইসলামকে ঐতিহ্য আকারে দেখলে সুবিধা হয় বেশি। কারণ, তাতে ক্ষমতা ও কালগত প্রশ্নটাকে বুঝতে সুবিধা হয়। মূলগতভাবে ঐতিহ্য একটা আইডিয়া বা ধারণা হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে ঐতিহ্যের বহুরকম ভেদ আছে। একজন মানুষ বহুরকম অভিজ্ঞতার ভেতরে বসবাস করে। এ কারণে তালালের কথা হলো অন্যান্য ঐতিহ্য থেকে নানান ধারণা ব্যবহার করে নতুন চিন্তাভাবনার পথ পরিষ্কার করা যায়। তালাল ঐতিহ্যের বিশুদ্ধতা নিয়ে চিন্তিত নন।[৬]

তালালের কথা গ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন রকম লোকজ, অধর্মীয় বা ভিনধর্মীয় ঐতিহ্যকে ইসলামের পরিসরে শনাক্ত করা সম্ভব। ইসলামকে এখানে যৌগিক কালচার বা সামাজিক ফাংশনের আকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ইসলামের টেক্সট কী বলে সেটা এখানে মুখ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু ইসলামের দ্বীন ধারণার সাথে তালালের ব্যাখ্যাত ধর্ম বা ট্র্যাডিশনকে কি এক কাতারে ফেলা যায়? তালালের 'ঐতিহ্য' অনেকটা উন্মুক্ত, অনির্দিষ্ট, প্রবাহমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল। 'দ্বীন' হচ্ছে একটা স্থিতিশীল অবস্থান বা ধারণা।

ট্র্যাডিশনের আলাপের সূত্রে আমরা এখন তালালের লেখা দুটো বহুল আলোচিত প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলবো। প্রথমটির শিরোনাম হলো 'The Idea of an Anthropology of Islam'। এটা ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। পরে এটা ২০০৯ সালে বিখ্যাত *Qui Parle* সাময়িকীতে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রথমেই বলি শিরোনামের কথা। তালাল ঠিক Anthropology of Islam বলতে কী বুঝিয়েছেন? ইসলামকে অবজেক্ট বানিয়ে পশ্চিমের চোখে তিনি কি ইসলামের নৃতাত্ত্বিক কাটাছেঁড়া করেছেন? এটা কি Islamic Anthropology হতে পারত না? ইসলামের দৃষ্টিতে নৃতত্ত্বকে দেখা অথবা নৃতত্ত্বের এক ধরনের ইসলামায়ন করা। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই প্রশ্নটা করে রাখলাম।

এ প্রবন্ধে তালাল ইসলামের নৃতত্ত্ব বিষয়ে কতকগুলো পদ্ধতিগত আলাপ করেছেন। বিশেষ করে, পশ্চিমা নৃতাত্ত্বিকদের ইসলাম নিয়ে বোঝাপড়ার বিষয়টা এবং সেই বোঝাপড়ার পদ্ধতিগত দুর্বলতা নিয়ে কথা বলেছেন। প্রথমে তিনি নৃতত্ত্বের একটা ইসলামি সংজ্ঞা খুঁজেছেন। কেউ বলেছেন সমন্বিত ধারণা হিসেবে ইসলামে এমন কিছু নেই। কেউ বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমষ্টি হচ্ছে ইসলাম। কেউ বলেছেন ইসলাম সমন্বিত ও স্থির এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যা মানুষের সামাজিক জীবনের সব দিককে পরিচালনা করে। কিন্তু তালাল এতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের মতো করে নৃতত্ত্বের একটা ইসলামি কাঠামো হাজির করার চেষ্টা করেছেন।

এরপরে তিনি বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক আরনেস্ট গেলনার ও ক্লিফোর্ড গির্টজের ইসলাম বিষয়ক ধারণাগুলোকে এক এক করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। গেলনার দেখান— ইসলাম হচ্ছে একটা সামাজিক ব্যবস্থার ব্লুপ্রিন্ট— নীলনকশা। এটা আল্লাহর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে ক্ষমতার বিভাজন বা রাজনৈতিক সংযমের কোনো ধারণা নেই। গেলনার আরো দেখান, ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানিটির বিপরীত রাস্তা ধরে। গেলনার একে বলেছেন মিরর ইমেজ। এখানে ইসলামের সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা হয়েছে। তালাল গেলনারের এই সুপারিশ গ্রহণ করেননি। কারণ, তার মতে ইসলামের ভেতরেও বৈচিত্র রয়েছে। রয়েছে নানা ধরনের চর্চা ও বিশ্বাসের ধারা। এই বৈচিত্রের সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রাচ্যবিদরা

ইসলামের ওপর দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিয়েছে। যেমন— অর্থোডক্স বনাম নন-অর্থোডক্স, গ্রেট ট্র্যাডিশন বনাম লিটিল ট্র্যাডিশন।

গেলনার ও গির্টজও ইসলামকে দুভাগে ভাগ করেছেন। নগরের শরিয়াহভিত্তিক উলামাদের ইসলাম এবং গ্রামের সমতাবাদী, স্থানীয় সংস্কৃতি ও সুফি প্রভাবসম্পন্ন ইসলাম। তালাল এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিহাসবিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেছেন এবং ইতিহাস ও ইসলামের ডিসকার্সিভ বা আলোচনামূলক স্টাইলের সাথে বোঝাপড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই বোঝাপড়ার জন্য তিনি সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনগুলোর দিকে নজর দেয়ার কথা বলেছেন। তার মতে, নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো বা রাজনীতি-অর্থনীতিকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে ফেলা উচিৎ নয়।

গেলনার ও গির্টজ মুসলিম সমাজকাঠামোকে নাটকের সাথে তুলনা করেছেন। কখনো কখনো ট্রাইবের সাথেও তুলনা করেছেন। এই ট্রাইবের নায়কেরা গেলনারের ভাষায়— কথা বলে না, চিন্তা করে না। শুধু নির্দিষ্ট নিয়মে আচরণ করে যায়। গেলনার ইসলামের ভাষাকে বলেছেন শাসনের একটা হাতিয়ার। গেলনার ট্রাইবকে মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ চেহারা হিসেবে দেখান। এর সাথে তালাল অমত করেন এই বলে যে, এরকম কোনো আদর্শ ট্রাইব নেই। এটা একটা শিথিল ক্যাটাগরি। এখানে বিচিত্র ধরনের সামাজিক ধারা রয়েছে। এটার কোনো স্থিতিশীল অর্থনীতি বা রাজনৈতিক কাঠামো নেই।

গেলনার ট্রাইবের আলোচনায় নারী ও কৃষকদের কথা বলেননি। তালাল দেখান, মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলেছে। ফলে স্থিতিশীল সমাজকাঠামোর ধারণাও সব সময় ঠিক নয়।

গেলনার গ্রাম ও শহরের ইসলাম বলে ক্যাটাগরি করেছিলেন। অনেক নৃতাত্ত্বিক বড়ো বড়ো সমাজবিজ্ঞানী যেমন— মার্কস, দুরখহিম, ম্যাক্স বেভারের সূত্র ধরে ইসলামকে ক্যাটাগরি করেছেন। ফলে ইসলাম নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। যেমন— মার্কসের জায়গা থেকে দেখলে শ্রেণি, দুরখহিমের জায়গা থেকে রিচুয়াল বা ধর্মাচার, বেভারের জায়গা থেকে স্ক্রিপচার বা শাস্ত্রভিত্তিক ইসলামের কথা বলা যায়। এই বহু ইসলামের ধারণা একটা প্রাচ্যবাদী উৎপাদন। তালাল বলেন, এই যে

ভিন্ন ভিন্ন ইসলামের সংজ্ঞায়ন নির্মাণ— এটা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার প্রয়োজনে, সাংস্কৃতিক যৌক্তিকতার কারণে। এই কারণে এটা শুধু ভিন্ন ভিন্ন চিত্রায়ন নয়, এটা একটা অসংগত নির্মাণও। এর ফলে এটা একটা অলীক বিরোধ ও সমতার ধারণা তৈরি করে, যা মানুষকে ধর্ম সম্পর্কে ভুল বার্তা দেয়। গেলনার দেখান ইসলাম মার্কসবাদের মতো টোটালিটিরিয়ান। কিন্তু তালালের কথা আধুনিক রাষ্ট্র ধর্মের চেয়ে পারভাসিভ বা ব্যাপক। এর পরে তালাল ইসলামের নৃতত্ত্ব নির্মাণের মূল আলাপে পৌঁছান এবং বলেন :

> If one wants to write an anthropology of Islam, one should begin, as Muslims do, from the concept of a discursive tradition that includes and relates itself to the founding texts of the Quran and the Hadith. Islam is neither a distinctive social structure, nor a heterogeneous collection of beliefs, artifacts, customs, and morals. It is a tradition.[৭]
>
> [যদি কেউ ইসলামের নৃতত্ত্ব লিখতে চান, তবে মুসলিমদের মতোই তাকে একটি আলোচনামূলক ঐতিহ্যের ধারণা থেকে শুরু করতে হবে, যা কুরআন এবং হাদিসের মতো প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থগুলোকে অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পর্কিত করে। ইসলাম কোনো স্বতন্ত্র সামাজিক কাঠামো নয় অথবা বিশ্বাস, শিল্পকর্ম, রীতিনীতি ও নৈতিকতার একটি নানাধর্মী সংগ্রহও নয়। এটা একটি ঐতিহ্য।]

এখানে তালালের প্রস্তাবনা হলো কোনো কিছুকে ইসলামি বলতে হলে তার মূল ভিত্তি ধরতে হবে কুরআন ও হাদিসকে। এটাই অর্থোডক্সি। ইসলামের ট্র্যাডিশন বা নৃতত্ত্ব নিয়েও একই কথা। তালাল ইসলামকে ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশন হিসেবে দেখেন। যে ট্র্যাডিশন অতীতের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নিয়ে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। গেলনারের মতো নৃতাত্ত্বিকরা ইসলামকে মুসলিম সমাজ দিয়ে বুঝেছেন। গির্টজ, র‍্যাডক্লিফের মতো নৃতাত্ত্বিকরা মুসলিম সমাজের

প্র্যাকটিস— আমল দিয়ে বুঝেছেন। তালাল অর্থোডক্সির ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ, তালালের কাছে :

> Orthodoxy is crucial to all Islamic traditions.[৮]
>
> [ইসলামের সকল ঐতিহ্যের জন্য প্রচলিত ধ্যানধারণায় বিশ্বাস (অর্থোডক্সি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।]

কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সেটা ঠিক করার দায়িত্ব অর্থোডক্সির। এরপর তালাল যোগ করেন :

> Wherever Muslims have the power to regulate, uphold, require or adjust correct practices, and to condemn, exclude, undermine, or replace incorrect ones, there is the domain of orthodoxy.[৯]
>
> [যেখানে মুসলমানদের সঠিক অনুশীলনগুলো নিয়ন্ত্রণ, বজায় রাখা, দাবি করা বা সামঞ্জস্য করার এবং ভুল অনুশীলনগুলোকে নিন্দা করা, বাদ দেওয়া, দুর্বল করা বা প্রতিস্থাপন করার ক্ষমতা রয়েছে, সেখানেই অর্থোডক্সির কার্যক্ষেত্র।

তালালের মতামত থেকে প্রতীয়মান হয়, তার কাছে ইসলামকে নৃতাত্ত্বিকভাবে বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে অর্থোডক্সি ও ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশনটা খুব জরুরি। অর্থোডক্সি হলো সমাজের ভেতরকার প্রতিষ্ঠিত মত, যা দালিলিক যুক্তি ও ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। কুরআন-হাদিসভিত্তিক মতামত অর্থোডক্সি হতে হলে ক্ষমতাও প্রয়োজন। যেখানে মুসলমানদের ক্ষমতা আছে কোনো মতকে তুলে ধরার বা বাদ দেওয়ার, সেটাকে বলে তালালের ভাষায় Domain of orthodoxy।

এবার আসা যাক তালালের ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশন বিষয়ক আলাপে। এটা হলো কুরআন-হাদিসকে মূল ধরে যুক্তি-তর্ক বাদ-প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে কোনো একটি চর্চা বা আমলকে ইসলামের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করা। কোনো একটি আমলকে ইসলামি বলা যাবে তখন, যখন এটা ইসলামের ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশন দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং মুসলমানদেরকে শেখানো হয়। এই আমলের তালিম দেন আলিম, খতিব, সুফি, শেখ, এমনকি অক্ষরজ্ঞানহীন পিতামাতা। কারণ, এটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মত। মুসলমান যা বলে বা করে, তা-ই ইসলামি ঘটনা

নয়। বরং, এটা যখন ইসলামের ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশন দ্বারা অনুমোদিত হয়, তখনই কেবল ইসলামসম্মত বলা সম্ভব।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, তালালের এ প্রবন্ধটি পুরোটাই নৃতত্ত্বের ধাঁচে লেখা। পশ্চিমের অ্যানালিটিক ক্যাটাগরি ধরে ইসলামের সাথে তিনি বোঝাপড়া করেছেন। এই ক্যাটাগরি ধরেই তিনি গেলনার বা গির্টজের সাথে তর্ক করেছেন। এ প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গেলনার বা গির্টজের গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে ইসলাম বোঝার জন্য আধুনিক নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানকাঠামোর ভেতরে তালাল অর্থোডক্সিকে জায়গা দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের ভেতরে হাজির থাকা ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশনকে নৃতত্ত্বের পরিসরে ফোকাস করেছেন। নৃতত্ত্বের ইসলামায়নজাতীয় ভাবনাচিন্তা এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য নয়।

তবে এ প্রবন্ধ পড়ার সময় একটা ভুল ধারণা হতে পারে। সাধারণ পাঠক মনে করতে পারেন ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশন ছাড়া ইসলামকে বোঝার বোধহয় কোনো উপায় নেই। এটা নৃতত্ত্বের বুঝ, ইসলামের নয়। নৃতত্ত্ব আর ইসলাম এক জিনিস নয়। ইসলামি ট্র্যাডিশনে তর্ক-বিতর্কের একটা সিলসিলা আছে বটে, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ইসলামকে চিরকাল বোঝা হয়েছে ঈমান-একিন-আমল-মুয়ামালাত-হক-আদল-ইহসান-ইনসাফ-নসিহা-তওবা-ইস্তিগফার-আখিরাত-হাশর দিয়ে। এটাই ইসলামের মুখ্য ট্র্যাডিশন। এগুলোর অনেককিছু নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ইসলামের কাম্য নয়। ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশনের শরিকানা এখানে গৌণ, গৌণকে মুখ্যের উপরে জায়গা দেওয়া সম্ভব কি? নৃতত্ত্বের পরিসরে যেটা সম্ভব, দ্বীনের পরিসরে সেটা কতটুকু সম্ভব— ভাবার বিষয়। তবে তালালের প্রবন্ধটি পশ্চিমা নৃতাত্ত্বিকদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে যে খুবই কাজের ও যুতসই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিন.

তালাল আসাদ ২০২০ সালে বিখ্যাত গবেষণাপত্র *Critical Times*-এ একটি নিবন্ধ লেখেন। এর শিরোনাম হলো 'Thinking about Religion through Wittgenstein'। অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত দার্শনিক

লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের চিন্তাকে ব্যবহার করে তিনি কুরআনে অন্তর্গত খোদার স্বরূপ নিয়ে ইসলামি ঐতিহ্যে যে মতবিরোধ-মতানৈক্য আছে, সেটার সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। আরো পরিষ্কার করে বললে, ভিটগেনস্টাইনের লেখালেখির সূত্রে তিনি ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। ভিটগেনস্টাইন ছিলেন অ-সারবাদী (Non-essentialist) পণ্ডিত। তিনি ধর্মকে বোঝার জন্য সংজ্ঞাকে জরুরি মনে না করে বাস্তব জীবনে ধর্ম কীভাবে হাজির থাকে, সেটার ওপরে জোর দেন। এটাকে তিনি বলেন ফরম অভ লাইফ। এই ফরম অভ লাইফ ধারণা তালালের ধর্ম বোঝার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে, ইসলামকে বুঝতে হলে ইসলামি ঐতিহ্যের ভেতরে সরাসরি হাত না বাড়িয়ে ভিটগেনস্টাইনের ঘাড়ে চড়ে বোঝার ব্যাপারটা চোখে লাগে। ধারণা করি, পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ার কাছে নিজের মতকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য তালাল ভিটগেনস্টাইনকে সাক্ষী মেনেছেন।

কুরআনে খোদাকে নিয়ে কতকগুলো মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণ আরোপ করা হয়েছে। যেমন— খোদার মুখ আছে, হাত আছে, তিনি ক্রোধ, ক্ষমা প্রভৃতি প্রকাশ করেন। এতে মনে হয়— খোদা হলেন বিবর্ধিত এক মানবীয় অস্তিত্ব, যার আছে অসীম ক্ষমতা ও অতলান্ত আবেগ। অন্যদিকে কুরআনের সূরা ইখলাসে খোদার স্বরূপ নিয়ে একটা বর্ণনা আছে— তিনি এক ও অবিভাজ্য, তিনি সময়হীন, তিনি জন্ম দেন না, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, তার তুলনীয় কেউ নেই।

এখানে একই চরিত্রের দ্বিবিধ রূপায়ন ঘটেছে— দৃশ্যমান চিহ্ন কারো পক্ষে কথা বলছে, অথবা অন্যকে সামনে রেখে কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলছে। ইসলামি পণ্ডিতদের কথা হলো— দুটির কোনো অর্থেই খোদার কোনো প্রতিনিধিত্ব হয় না। যদি তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব না-ই হয়, তাহলে কুরআনের বয়ানেও স্ববিরোধী প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আসে না। মধ্যযুগে মুতাজিলারা এসব প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক করেছেন। দার্শনিক আল-রাজি দেখান— দ্বন্দ্বটা প্রধানত আকল (যুক্তি) ও নাকলের (ওহি) দ্বন্দ্ব। ওহি চায় প্রশ্নহীন আনুগত্য। আকল চায় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিতরা দেখান ওহি ও আকলের দ্বন্দ্বে ওহিকেই চূড়ান্ত সাব্যস্ত করতে হবে, যেখানে খোদা নিজেই তার প্রেরিত ওহিকে বলেছেন আল-কিতাব আল-মুবিন— সকল অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত।

সেক্ষেত্রে খোদার বাণীকে বুঝতে হবে তিনি যেভাবে উচ্চারণ করেন, সেভাবে। যেরকম করে কিছু বুদ্ধিজীবী মনে করেন, তিনি এভাবে বুঝিয়েছেন— সেরকম করে নয়।

এরকম তর্ক-বিতর্ক আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ— আসমাউল হুসনা নিয়েও উঠেছে। প্রকৃত সত্য হলো— এসব হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নাম, যা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এসব নাম এমন ধারণা দেয়, যা দুনিয়াবি সাক্ষ্য-প্রমাণ-ব্যাখ্যার অতীত। কিন্তু এর উচ্চারণ মানবীয় চরিত্রের বিকাশ ও পরিবর্তনের সূচনা করে। ঐতিহ্যবাদী আলেমরা মনে করেন কুরআন খোদার স্ববিরোধী বয়ান নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয় না। বরং, খোদা মানুষকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন ভিন্ন ভিন্ন মানবীয় সময় ও পথ ধরে— যেসব পথের ভাষা মানবীয় ভাষায় সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু মানুষ সাড়া দিতে পারে। কুরআন কোনো কায়িক তিলাওয়াত নয়, বা কোনো উচ্চারিত কণ্ঠস্বর নয়। এখানে খোদা কথা বলছেন, শ্রোতারা শুনছে। খোদার অ-প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে তাকওয়া নির্মাণের ঐশী দাবি। এটা এক ধরনের ফরম অভ লাইফ তৈরির প্রক্রিয়া। ফরম অভ লাইফ হচ্ছে এক ধরনের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা, যেখানে খোদাই চূড়ান্ত কেন্দ্র। তালাল এই ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধাকে পাসকালের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, এটা হচ্ছে অসীম বিপুলতার মতো একটা স্থানে মানুষের তাৎপর্যহীনতার বোধ। এই তাৎপর্যহীনতার বোধকে অতিক্রম করা সম্ভব তালালের মতে ভিটগেনস্টাইনের ফরম অভ লাইফ বা জীবনযাপনের ধারণার ভেতর দিয়ে। এই জীবনযাপন হচ্ছে আমল বা চর্চা। এই আমল হচ্ছে ধার্মিকতার আমল। তালাল ইবন তাইমিয়ার উদাহরণ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন— এই আমল দিয়ে বোঝা যাবে ঈমানের শক্তি। তালাল মনে করেন ভিটগেনস্টাইনের ফরম অভ লাইফ দিয়ে নাকল ও আকলের দ্বন্দ্বকেও সমাধান করা যেতে পারে।

তালাল এখানে জোর দেন আমলের ওপর। কিন্তু ঈমান ছাড়া আমলের দাম নেই। আমল হচ্ছে ঈমানের অধঃস্তন। অবশ্যই আমল ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামের কথাও তা-ই। ইসলামি পণ্ডিতরাও তা-ই বলেছেন। ইবন তাইমিয়ার কথাও তা-ই। তাইমিয়ার আমলের আলাপকে তালাল স্রেফ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভিটগেনস্টাইনের ফরম অভ

লাইফের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। ভিটগেনস্টাইনের দার্শনিক কূটাভাস দিয়ে ইসলামের ঈমান ও আমলকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ভিটগেনস্টাইনের দর্শন ঠিক ইসলামকেন্দ্রিক নয়। তার কাজ প্রধানত ভাষা ও তার মর্মকেন্দ্রিক। তার এই ধারণাকে অন্য বিশ্বাস ও চর্চার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা সম্ভব। ভিটগেনস্টাইনের ফরম অভ লাইফে খোদা নেই, কিন্তু খোদার ব্যাপারে আগ্রহ আছে। ধর্ম নেই, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা আছে। পশ্চিমে বহু খ্রিষ্টান আছে যারা ক্রিসমাস মানে, ইস্টার মানে, কখনো কখনো চার্চেও যায়। কিন্তু গডকে মানে না। ভিটগেনস্টাইনের ফরম অভ লাইফে তার ছাপ আছে।

এই ফরম অভ লাইফ ইসলামের ফরম অভ লাইফ নয়। তালাল ভিটগেনস্টাইন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার যুক্তিকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। ইসলামের একটা নিজস্ব গ্রামার, নিজস্ব ফরম আছে। আছে নিজস্ব মেটাফিজিক্স, আছে তওহিদ, রিসালাত, আখিরাতের ধারণা। মুসলমান আমল করে আখিরাতের মুক্তির জন্য। এটাই তার জীবনের সর্বোচ্চ চাওয়া। আলটিমেট ট্রুথ। এটাই তার ফরম অভ লাইফ। অন্য কিছু নয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, তালাল আজীবন চিন্তার বদল করেছেন। ট্র্যাডিশন বিষয়ক আলাপগুলোতেও তার চিন্তা বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয়েছে, বাঁক নিয়েছে, খাত বদল হয়েছে। তার চিন্তার কোনো স্থির বিন্দু নেই। এ কারণেই ট্র্যাডিশনকে তিনি কখনো খুব মুক্তভাবে আলোচনা করেছেন, কখনো কাঠামোগতভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কখনো পশ্চিমা ফ্রেমে আলাপ করেছেন, কখনো ইসলামি তুরাসের কাছাকাছি চলে এসেছেন। এটা হয়েছে তালালের যে-কোনো চিন্তাকে মোকাবিলা করার প্রবণতা থেকে। পশ্চিমা চিন্তাকে মোকাবিলা করার জন্য তিনি কখনো কখনো ইসলামি ট্র্যাডিশনকে ব্যবহার করেছেন। আবার ইসলাম-চিন্তাকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমা ফ্রেমে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। ট্র্যাডিশনকে এই বিচিত্রভাবে ব্যাখ্যা করার কারণে তার লেখালেখি বা আলাপকেও বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কখনো কখনো তা স্ববিরোধীও মনে হয়। এটাই হয়তো তালালের স্টাইল। এ কারণে তার শিষ্যকুলের ভেতরেও তাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। একদিকে

আছে ইসলামঘেঁষা ওভামির আনঅফিশিয়াল দল। আরেকদিকে আছে সমাজতন্ত্রঘেঁষা ডেভিড স্কটের দল। এই উভয় দলের মতবাদিক উদ্যমের ফলে তালালের চিন্তার তাফসির নিয়ে একটা বাইনারি তৈরি হয়েছে। তালাল আজীবন যে বাইনারিকে নির্মূল করার জন্য নিজের সমস্ত প্রতিভা খরচ করলেন, জীবনের গোধূলিতে এসে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি সেই বাইনারির শিকার হলেন।

চার.

তালাল আসাদ প্রথম যে বইটি লিখে বিখ্যাত হন, তার নাম *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*। এটা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। এ বইটা ঠিক ধর্মের ইতিহাস নয়, বা কোনো ধর্মবিদের ধর্মের পর্যালোচনা নয়। বরং, নৃতাত্ত্বিকের চোখে ধর্ম কীভাবে ধরা দেয়, তার এক নিবিড় পর্যবেক্ষণ। তালালের এই নৃতাত্ত্বিক সফরে তাই উঠে আসে একদিকে মধ্যযুগের খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় রীতি ও প্রথা, অন্যদিকে সাম্প্রতিক আরব ধর্মবিদদের ধর্মোপদেশ। ধর্মকে তিনি শুধু গতানুগতিক নৃতাত্ত্বিকদের মতো রীতি, প্রথা, প্রতীকের ভেতর দিয়ে দেখেন না। তিনি ধর্মকে ফরম অভ লাইফ হিসেবে দেখেন। এটা মানুষের যৌথচর্চা, তৎপরতা ও জীবনাচারের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে। এটাকে আরেকটু বিস্তৃত করলে বলা যায়— ধর্ম যেভাবে মানুষের জীবনযাপনের ভেতরে অবস্থান বা বসবাস করে, অথবা ধর্মের ভাষার ভেতরে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করে, তারা ঠিক কী নিয়ে বাঁচে, কীভাবে বাঁচে। ফরম অভ লাইফ শব্দটা আগেই বলেছি তালাল পেয়েছেন দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের বরাতে। তিনি তার লেখায় প্রথম জার্মান শব্দ লিবেনস ফরম (Lebens form) বা ফরম অভ লাইফ কথাটা ব্যবহার করেন। সেকুলারিজম বোঝার ক্ষেত্রেও তালাল এই ফরম অভ লাইফ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন।

বইটিতে ভূমিকাসহ আটটি প্রবন্ধ রয়েছে এবং এগুলোকে চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জিনিয়লজিস (Genealogies),

আরকাইজমস (Archaisms), ট্রান্সলেশনস (Translations) ও পলেমিকস (Polemics)। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে দুটি করে প্রবন্ধ রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মোটের ওপর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মের যে জিনিয়লজি— তার অনুসন্ধান।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে আধুনিক ইতিহাসের বিষয় হিসেবে ধর্মের আগমনের কথা। এখানে তালাল নৃতাত্ত্বিকদের সমালোচনা করে লিখেছেন— এরা নিছক প্রতীকায়নের ভেতর দিয়ে ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করে, প্রতিদিনের জীবনযাপনের অংশ হিসেবে পর্যালোচনা করে না। নৃতাত্ত্বিকরা সাধারণত সাংস্কৃতিক ঘটনাগুলোকে টেক্সট হিসেবে পাঠ করে। যার ফলে তারা ধর্মীয় আলাপগুলো যে চর্চা ও বয়ানের ওপর নির্ভর করে, যা সাধারণত 'ধর্মীয়' না-ও হতে পারে, অন্তত টেক্সটের ধারণাগত জায়গা থেকে, তাকে তারা উপেক্ষা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি মধ্যযুগের খ্রিষ্টধর্মের দুটো প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন সেকালের চার্চে দৈহিক বেদনা ও আত্মপীড়নের যে চর্চা হতো ধার্মিকতা অর্জনের জন্য, তার উপযোগিতা ছিল বলে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক ধর্মতত্ত্ব ও সেকুলার নৈতিকতা এর গুরুত্বকে স্বীকার করে না। বরং, এটাকে অসংস্কৃত হিসেবে নিন্দা করে। তালাল এখানে আরো দেখান যে, মধ্যযুগে চার্চের প্রায়শ্চিত্য ও বিচারগত ধারণা কীভাবে আধুনিকতা আসার সাথে বদলে গেছে। এ অধ্যায়ের আলোচনা করতে যেয়ে তালাল কিছুটা মিশেল ফুকোর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং দেখিয়েছেন— চার্চের প্রায়শ্চিত্য ও আনুগত্যের ধারণা কীভাবে আত্মনির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলত।

তৃতীয় অধ্যায়ে তালাল দেখান পশ্চিম ও অ-পশ্চিমের ইতিহাসের ভেতরে একটা অসমতা আছে। এই অসমতা তৈরি হয়েছে ক্ষমতা সম্পর্কের কারণে। পশ্চিম নৃতাত্ত্বিক অনুবাদের সমস্যায় আক্রান্ত। কারণ, পশ্চিমের বিদ্যা দিয়ে অ-পশ্চিমকে পাঠ করে সেটি আবার পশ্চিমের ভাষায় হাজির করতে হয়। অন্যদিকে অ-পশ্চিমা ধর্মীয় ঐতিহ্যের দিক দিয়ে সমস্যা হলো আলোকায়নের পর্যালোচনামূলক যুক্তিশীলতার সাথে স্বস্তি বোধ না করা। এখন সমস্যা দাঁড়ালো এরকম

জায়গায়— এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় ব্যাখ্যা করা এবং পবিত্র ধ্বংসাবশেষকে এক দরগা থেকে আরেক দরগায় স্থানান্তর করা।

শেষ অধ্যায়টি লেখা হয়েছে সালমান রুশদিকেন্দ্রিক ঘটনা এবং তৎপরবর্তী ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিপরীতে ক্রুদ্ধ উদারনৈতিকতার অবস্থান উপলক্ষ করে। বলা বাহুল্য, বইটি লেখা হয়েছে পশ্চিমা জ্ঞানকাঠামোর সীমানার ভেতরে থেকে এবং ওই কাঠামোকে মানদণ্ড ধরে। তালালের ধর্মের সাথে বোঝাপড়া, ধর্মের সংজ্ঞায়ন ওই কাঠামোর আনুগত্য মেনেই হয়েছে। আধুনিক নৃতত্ত্বের যে ধারণা, তা কিন্তু আলোকায়নজাত জ্ঞানেরই ফসল। ওই জ্ঞানের বরাতে বইটি লেখা হলেও তালালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওই জ্ঞানের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার দিকেও তিনি আমাদের কিছু ইঙ্গিত দেন। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম শুধু নিজের জন্যই সংজ্ঞা তৈরি করেনি, পশ্চিম অ-পশ্চিমের সংজ্ঞাও তৈরি করেছে, যা একদিক দিয়ে পশ্চিমেরই ইতিহাস। তিনি এ বই লেখার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন খ্রিষ্টান ও উত্তর-খ্রিষ্টান যুগের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে তার এই বিশ্বাস জন্মেছে ধারণাগতভাবে পশ্চিম অ-পশ্চিমা ঐতিহ্য নির্মাণে ভূমিকা রাখে। যেমন— কোনো নৃতাত্ত্বিককে আজকাল মুসলিম বিশ্বাস ও চর্চা নিয়ে কথা বলতে হলে তাকে আধুনিক পশ্চিমে 'ধর্ম' কীভাবে ধারণা ও চর্চা হিসেবে গড়ে উঠেছে, তার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এই যে পশ্চিমকে সামনে রেখে অ-পশ্চিমকে দেখা, যার ফল হয়— তিনি লিখেছেন— একজন সউদি ধর্মবিদ যখন মধ্যযুগীয় ইসলামি টেক্সটের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করেন, তখন সেটি হয়ে যায় স্থানীয় ঘটনা। কিন্তু পশ্চিমের লেখকরা যখন আধুনিক সেকুলার সাহিত্যের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করেন, তখন সেটা বিশ্বজনীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যদিও প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্বে অবস্থান করে এবং প্রত্যেকেরই গ্রহণ-বর্জনের নিজস্ব মাত্রা রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে ক্ষমতা এবং ক্ষমতার কারণেই তৈরি হয় এক অসম ভাষা— unequal language। আধুনিক পুঁজিবাদি ব্যবস্থা ও আধুনিকায়নকৃত জাতিরাষ্ট্র হচ্ছে এমন দুটো শক্তি, যা এই অসম ভাষার পরিসর তৈরি করে। এভাবে ক্ষমতা ধর্ম-সংস্কৃতি-পরিচয় প্রভৃতির নতুন অর্থ উৎপাদন, বিকৃতিসাধন ও অর্থ ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ করে। ক্ষমতা কাঠামোর অসমতার ফলে পশ্চিম থেকে অ-পশ্চিম ভাষা গ্রহণ করে। সেটা জোরপূর্বক আরোপণ, ধীর অনুপ্রবেশ কিংবা স্বেচ্ছাকৃত ধার— যে-কোনো

একটা হতে পারে— যা অ-পশ্চিমা জগতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। কী সেই সম্ভাবনা? একটা বৈশ্বিক ধারণার ভিত্তিতে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে হবে, যার গোড়া থাকবে পশ্চিমে। পুরোনো বিশ্বকে বদলে দিতে হবে এবং 'স্থানীয়' মডেলকে ইতিহাস নির্মাণের প্রক্রিয়ার ভেতরে যুক্ত করা যাবে না। সেটা তাহলে ইতিহাসের উল্টো যাত্রা হবে। তালাল লিখেছেন :

> From the Cargo Cults of Melanesia to the Islamic Revolution in Iran, they merely attempt (hopelessly) 'to resist the future' or 'to turn back the clock of history'.[১০]
>
> [মেলানেশিয়ার কার্গো কাল্ট থেকে শুরু করে ইরানের ইসলামি বিপ্লব পর্যন্ত তারা কেবল (আশাহতভাবে) 'ভবিষ্যতকে প্রতিহত করতে' বা 'ইতিহাসের ঘড়িকে পিছিয়ে দিতে' চেষ্টা করে।]

এই প্রক্রিয়ায় যে একক বিশ্ব গড়ে উঠবে, তালাল প্রশ্ন তোলেন, সেখানেও তো :

> In this way, the idea of a single nature of all humans appeared to concede that some are evidently 'more mature' than others.[১১]
>
> [এভাবে মানুষের একক প্রকৃতির ধারণাটি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল যে, কিছু মানুষ অন্যদের চেয়ে স্পষ্টভাবে 'বেশি পরিণত'।]

তালালের এ বইটির প্রথম প্রবন্ধের নাম The Construction of Religion as an Anthropological Category। এখানে তিনি ধর্মকে একটা নৃতাত্ত্বিক বর্গ হিসেবে দেখেছেন। বিশেষ করে নৃতাত্ত্বিক বর্গ হিসেবে একালে ধর্মের কীভাবে নির্মাণ হয়েছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ধর্মকে কালচার (সংস্কৃতি), কনসেপ্ট (ধারণা), পারসপেক্টিভ (অবস্থানগত সঠিক দৃষ্টি), সিম্বল (প্রতীক), প্র্যাকটিস (চর্চা) প্রভৃতি জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ধর্মকে মর্মের বা তাৎপর্যের এবং ধর্মীয় অর্থের জায়গা থেকেও অবলোকন করেছেন। তালালের এই ধর্ম অধ্যয়নের পুরো ব্যাপারটা

হয়েছে বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ক্লিফোর্ড গির্টজের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলাপের সূত্র ধরে। গির্টজের লেখার ওপর ভিত্তি করে তিনি তার আলোচনা-সমালোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এটা তালালের লেখার একটা ধরন। সাধারণত কোনো একজন লেখকের লেখার ওপর ভিত্তি করে তিনি তার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিটা গড়ে তোলেন।

ধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তালাল বলেছেন— ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকের ব্যাপারটা উত্তর রিফরমেশন পশ্চিমা ধারণা। এটা দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্যে ধর্ম ও রাজনীতির সংলগ্নতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বিপর্যয় তৈরি হবে। কারণ, দুটোর দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থান ভিন্ন। অন্যদিকে তালাল গির্টজের দেখা ধর্মের সংজ্ঞার সাথে একমত হননি। গির্টজ মনে করেন ধর্ম একটা সাংস্কৃতিক পদ্ধতি। এটাকে তিনি ধর্মের একটা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা হিসেবে দাঁড় করাতে চান। তালাল মনে করেন ধর্মের কোনো বিশ্বজনীন সংজ্ঞা হয় না। তিনি মনে করেন— যেসব মত, চর্চা, আইনকানুন, শর্ত, প্রকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোর ভেতর দিয়ে আমরা মধ্যযুগের খ্রিষ্টান ধর্মকে চিনি, তা আধুনিক কালে অনেক বদলে গেছে। ধর্মের শক্তি বলে আমরা যা বুঝি, তার প্রয়োগ পদ্ধতিও বলা চলে আগের মতো নেই। এখন এটা ভিন্নভাবে আইন-কানুন, জ্ঞান উৎপাদনীয় ব্যবস্থা ও আত্মনির্মাণের কারিগরি আয়ত্ত্ব করেছে। এর কারণ, ইতিহাসের ডিসকারসিভ পদ্ধতিতে ধর্মের সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়েছে।

তালালের এই আলোচনা প্রধানত খ্রিষ্টান ধর্মের ইতিহাস ধরে করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মের ভেতরে রিফরমেশন, প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ ধর্ম ব্যাপারে যেসব নতুন যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, তা দিয়ে ইসলাম ধর্মের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা তা-ও আমাদের ভাবা দরকার। ধর্মের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান ও ইসলামি ধারণার সাধারণীকরণ করা যায় কিনা, সেটাও একটা আলোচনার বিষয় বটে।

তালাল তার 'Toward a Genealogy of the Concept of Ritual' প্রবন্ধে দেখান— খ্রিষ্টান ধর্মের ইতিহাসে Ritual শব্দটার অর্থ বারবার বদলে গেছে। কখনো এটা আচার অর্থে বোঝানো হয়েছে, কখনো এটা চার্চের পরামর্শমূলক বই হিসেবে দেখানো হয়েছে। মধ্যযুগে চার্চের ইতিহাসে রিচুয়ালকে কখনো কখনো ধার্মিকতা অর্জনের

মাধ্যম হিসেবে মনে করা হতো। সে-সময় চার্চের সন্ন্যাসীরা রিচুয়ালকে অনুসরণ করে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করত। সন্ন্যাস জীবনকে ধরে রাখার জন্য এই রিচুয়ালগুলোর প্রয়োজন হতো। এই রিচুয়ালগুলোর ভেতরে ছিল প্রার্থনা, উপবাস, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সংগীত প্রভৃতি। ধর্মীয় কিতাবাদি নকল করাও ছিল এসব রিচুয়ালগুলোর অন্তর্গত। এমনকি ক্যালিগ্রাফিকেও এই আচারের অন্তর্গত করা হয়েছে।

তালাল দেখান, চার্চের এই শৃঙ্খলাপূর্ণ আচারগুলোর সাথে সন্ন্যাসীদের অন্তর্গত মতলব বা নিয়তের একটা সম্পর্ক ছিল। এর মানে, ভেতর ও বাইরের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না। বাইরের রিচুয়ালগুলো অন্তর্গত মনে এক ধরনের নৈতিক প্রস্তাবনা তৈরি করত। শিল্পতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী সমাজের উত্থানের ফলে ধর্মের যে প্রান্তিকীকরণ হলো, তা এই ভেতর ও বাহিরের যোগাযোগ ছিন্ন করে দিলো। আধুনিক সমাজে মানুষ বিভিন্ন ধরনের নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে, ধার্মিক জীবনযাপন না-ও করতে পারে এবং ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা নানা রকম কৌশল ও পরিসংখ্যানগত হিসাব-নিকাশের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এর পরের প্রবন্ধের নাম 'Pain and Truth in Medieval Christian Ritual'। তালাল এখানে দেখান মতাদর্শের বাইরে শরীরী আমল দিয়ে নৈতিকতার চর্চা। উদাহরণ হিসেবে তিনি মধ্যযুগে খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরা যেভাবে আত্মপীড়নের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করত তার কথা বলেন। সব রকমের জাগতিক চাহিদা কমিয়ে দিয়ে নিজের ওপর সন্ন্যাসীরা এক শক্ত নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা আরোপ করত। এই শৃঙ্খলা আরোপনের উদ্দেশ্য ছিল সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো। সন্ন্যাসীরা মনে করত স্বর্গীয় করুণা ছাড়া অপরাধ মুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাই তারা নিজেদের জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল যাতে আত্মার দূষণমুক্তি ঘটে। এই বেদনা আসলে সত্যকে পাওয়ার বেদনা। সন্ন্যাসীদের এই নৈতিক চর্চা চার্চের নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হতো। তালাল একেই বলেছেন Power of Christian Ritual। সন্ন্যাসীদের এই নৈতিক চর্চা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মিশেল ফুকো তার বিখ্যাত টেকনোলজিস অভ সেলফের ধারণা গড়ে তোলেন।

তালাল আরো দেখান, চার্চগুলোতে পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্যের বিধান ছিল। কেউ কোনো অপরাধ করে ফেললে চার্চ তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। তখন অপরাধী স্বেচ্ছায় এসে জনসমক্ষে পাপ স্বীকার করলে, তাকে কিছু কষ্টকর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হতো। এই অভিজ্ঞতার শেষে তাকে আবার চার্চে ফিরিয়ে আনা হতো, যাতে সে আবার সত্যের সাক্ষাৎ পায়। এভাবে তার অপরাধমুক্তি ঘটত। অপরাধী পরকালের দীর্ঘ ও অনিশ্চিত শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এটা করত। সত্যের কাছে ফিরে আসার এই প্রক্রিয়াকে বলা হতো রিকনসিলিয়েশন। এই সন্ন্যাসব্রতের শৃঙ্খলা কোনো চাপানো বিষয় ছিল না। এই শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে নিজের ভেতর থেকে সাজিয়ে তুলত। তালাল একে বলেছেন স্বেচ্ছা আনুগত্য। চার্চের এই নিয়মকানুনের লক্ষ্য ছিল স্বর্গীয় কর্তৃত্বের সামনে নতি স্বীকার। এখানে খোদা হলেন এজেন্সি।

এরপর তালাল দেখান, রোমান আইনের প্রভাবে মানুষ নিজের চোখে প্রমাণ দেখতে চাইল। এটার জন্য সে আইনি তদন্তের ব্যবস্থা করল এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য শারীরিক পীড়নের আশ্রয় নিলো। আইনি নির্যাতন ও চার্চের স্বেচ্ছা পীড়নের ভেতরে তফাৎটা কী? প্রথমটার এজেন্সি মানুষ, দ্বিতীয়টির এজেন্সি ঈশ্বর। প্রথমটির উদ্দেশ্য অপরাধের বিচার, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য অপরাধ থেকে মাফ পাওয়া। প্রথমটি বিচারপ্রাপ্তির বেদনা, দ্বিতীয়টি সত্যের জন্য বেদনা। এখানে তালালের মন্তব্য হচ্ছে— মানুষ যখন এজেন্সি নিজের হাতে তুলে নিলো, তখন থেকেই আবির্ভাব হলো যুক্তিশীলতার, তারপরে সেকুলারিজমের। ঈশ্বর পিছিয়ে গেল।

তালালের এই ধারার আরেকটি প্রবন্ধের নাম 'Discipline and Humility in Christian Monasticism'। মধ্যযুগের খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে পাপকে আত্মার জন্য বিপদজনক মনে করা হতো এবং এর মোকাবিলায় অবিরত সচেষ্ট থাকার উদ্যোগের কথা বলা হতো। পাপে মগ্ন থাকা অবস্থায় মানুষ চরম ঝুঁকির মধ্যে থাকে। ঈশ্বরের অসীম দয়াই কেবল তাকে মুক্ত করতে পারে। এই কারণেই খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠ ও আশ্রমগুলোতে কিছু শৃঙ্খলাপদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের আত্মাকে পাপমুক্ত করার জন্য আত্মার সংস্কারের ওপর জোর

দেওয়া হতো। মিশেল ফুকো সন্ন্যাসীদের এই আত্মার সংস্কারমূলক তৎপরতাকে বলেছেন Sacrifice of the self। এই সংস্কার পরিকল্পনা হতো বাইবেল ও বিভিন্ন খ্রিষ্টান সাধুদের লেখার ওপর ভিত্তি করে। এভাবে বাইবেলকে কেন্দ্র করে এসব আশ্রমে এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য ডিসিপ্লিন তৈরি হয়। এই ডিসিপ্লিন বলতে বোঝানো হতো চার্চের নেতৃস্থানীয় কোনো সাধুর নেতৃত্বে খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞানকে সন্ন্যাসীদের শারীরিক ও মানসিক চর্চার ভেতরে নিয়ে আসা। এই আধ্যাত্মিকতা চর্চার জন্য চার্চের হায়ারারকির আনুগত্য এবং কায়িক শ্রমের কথা বলা হতো। কায়িক শ্রম বলতে প্রধানত ঈশ্বরের কাজ বোঝান হতো। যেমন— ধর্মগ্রন্থ পড়া, ঈশ্বরের জন্য গান গাওয়া ইত্যাদি। এই ডিসিপ্লিনের ভেতরে হিউমিলিয়েশনের ব্যবস্থা ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে অহংকারকে খুব বড়ো রকমের পাপ মনে করা হয়। অহংকারবশত কেউ যদি ঈশ্বরকে অমান্য বা অবমাননা করত, তবে তাকে চার্চের নিয়মানুযায়ী তার চেয়ে নিচু কোনো কিছু, প্রাণসহ বা প্রাণহীন যে-কোনো কিছু হতে পারে, তার সামনে অবনত হয়ে প্রায়শ্চিত্য করতে হতো।

তালাল এসব বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন— চার্চের এই নিয়মগুলো একটা ডিসিপ্লিনারি রেজিম— ক্ষমতাকাঠামোর ভেতরে গড়ে উঠেছিল। তিনি আরো দেখান, চার্চের এই ক্ষমতাকাঠামোর ধারণা পরবর্তীকালের অনেক সেকুলার কাঠামোর ভেতরেও আত্মস্থ হয়েছিল।

এই বইটির Translations অধ্যায়ে দুটো প্রবন্ধ আছে, যার প্রথম প্রবন্ধের নাম 'Cultural Translation in British Social Anthropology'। এই প্রবন্ধে তিনি নৃতাত্ত্বিকদের কিছু সমস্যার কথা বলেছেন। নৃতাত্ত্বিকরা সাধারণত অ্যাকাডেমিয়ার ব্যাকরণ ধরে একটা সমাজকে বোঝাপড়ার চেষ্টা করে। এটা শুধু শব্দের বিমূর্ত তরজমা নয়। এটা একই সাথে ভিন্ন একটা ভাষায় কথা বলা এবং জীবনের একটা ভিন্নরূপকে বোঝাপড়ার চেষ্টা করা। তালাল এই জিনিসটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একজন ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে সমাজের ভেতর বর্তমান বয়ানকে বুঝে একটি টেক্সটে রূপান্তর করা। অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিকের কাজ হচ্ছে সমাজের ভেতরে বর্তমান

চর্চাগুলোর অন্তর্গত অর্থকে সাংস্কৃতিক টেক্সট হিসেবে হাজির করা। একজন নৃতাত্ত্বিক একটি ভিনদেশি বা ভিনগোত্রের মানুষের জীবনাচার অধ্যয়ন শেষে যখন দেশে ফেরে এবং তার গবেষণাকে যখন নিজের ভাষায় হাজির করতে হয়, তখনই সমস্যাটা শুরু হয়। একটা শব্দকে অন্যভাষায় রূপান্তর করা, আর একটা সংস্কৃতিকে অন্য ভাষার ভেতরে আটকানো এক কথা নয়। তালালের প্রশ্ন— এই নতুন ভাষায় উপস্থাপিত গবেষণাপত্র কি যথার্থ হয়ে ওঠে? যেখানে ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে, এই সমস্যাটা আরো বেড়ে যায়। তালাল লিখেছেন :

> To put it crudely, because the languages of third world societies—including, of course, the societies that social anthropologists have traditionally studied—are seen as weaker in relation to Western languages (and today, especially to English), they are more likely to submit to forcible transformation in the translation process than the other way round.[১২]
>
> [কৃত্রিমভাবে বলতে গেলে, তৃতীয় বিশ্বের সমাজসমূহের ভাষাগুলো— যার মধ্যে অবশ্যই সমাজ নৃতত্ত্ববিদরা ঐতিহ্যগতভাবে যে সমাজগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন, সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত— পশ্চিমা ভাষার (এবং বর্তমানে, বিশেষ করে ইংরেজির) তুলনায় দুর্বল হিসেবে দেখা হয়। এ-কারণে, অনুবাদ প্রক্রিয়ায় জোরপূর্বক পরিবর্তনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা তাদেরই বেশি, উল্টোটা নয়।]

এক্ষেত্রে তালাল আধুনিক আরবি ভাষার উদাহরণ দেন। উনিশ শতক থেকে আরবি ভাষায় বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা থেকে প্রচুর তরজমা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক লেখাজোখা, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ আরবিতে রূপন্তর হয়েছে। এর ফলে শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থ, ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও অনেক রূপান্তর এসেছে, যা আরবিকে ইউরোপীয় ভাষাগুলোর কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এই রূপান্তর ভাষার ক্ষেত্রে অসম ক্ষমতার নির্দেশ করে।

তালালের অনুসিদ্ধান্ত হলো :

> The inequality of languages is a feature of the global patterns of power created by modern imperialism and capitalism.[১৩]
>
> [আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষমতার বৈশ্বিক বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো ভাষার অসমতা।]

এ কারণে শক্তিশালী ভাষায় যারা নৃতাত্ত্বিক গবেষণাপত্র তৈরি করছেন, তারা দুর্বল ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতিকে কতটুকু তুলে আনতে পারছেন এবং সেটা কতটুকু যথার্থ হতে পারছে, তা একটা প্রশ্ন হয়ে আছে।

Translations অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম 'The Limits of Religious Criticism in the Middle East'। তালাল এখানে দেখান অ-পশ্চিমা দেশের পণ্ডিতরা তাদের নিজেদের ইতিহাস বুঝতেও পশ্চিমের দ্বারস্থ হন। কারণ, এটার ভেতর দিয়ে 'বিশ্ব ইতিহাস' তৈরি হয়েছে। এই কারণে বিশ্ব ইতিহাস পূর্বতন ইতিহাসকে 'স্থানীয় ইতিহাস' হিসেবে শনাক্ত করে। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ইসলামের ইতিহাসকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়। পশ্চিমারা ইউরোপীয় আলোকায়নকে কেন্দ্র ধরে অ-পশ্চিমা ঐতিহ্যের সাথে বোঝাপড়া করে এবং সেভাবেই মূল্যায়ন করে। এভাবে তারা ইসলামি রাষ্ট্রকে কর্তৃত্ববাদী হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং মনে করে এখানে জনসমালোচনাকে বৈরী হিসেবে দেখা হয়।

তালালের কথা হলো, নৃতাত্ত্বিকদের উচিত হবে প্রত্যেক ঐতিহ্যকে তার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করা, এমনকি এটা যদি আধুনিকতার শক্তি দ্বারা রূপান্তরিত ও পুনর্নির্মিত হয়েও থাকে। আরো সূক্ষ্মভাবে বলতে হয়, নৃতাত্ত্বিকদের উচিত প্রত্যেক ঐতিহ্যের নিজস্ব যুক্তির ধারাকে বোঝা। এইসব নৃতাত্ত্বিকদের উচিত হবে কোনো একটা ঐতিহ্যের প্রতি ব্যক্তিগত অপছন্দকে চাপিয়ে রাখা, যদি তারা সেটার সাথে বোঝাপড়া করতে চায়। এর বাইরে তাদের বোঝা দরকার, আলোকায়নের যুক্তির ধারার বাইরে অ-আলোকায়নের ঐতিহ্য রয়েছে এবং তাদের রয়েছে ভিন্ন যুক্তির ধারা।

তালাল এ প্রবন্ধে দার্শনিক কান্টের বরাতে দেখান, পশ্চিমে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে জনসমালোচনা গৃহীত হয়। এটা করা হয় আলোকায়নের অধিকারের জায়গা থেকে। কিন্তু ইসলামের ভেতরেও জনসমালোচনার ঐতিহ্য আছে। সেটা আলোকায়নের ঐতিহ্য দিয়ে বোঝা যাবে না। ইসলামে জনসমালোচনা হয় মরালিজমের জায়গা থেকে। সুতরাং, ইসলামে যুক্তি-তর্ক-সমালোচনার জায়গা নেই কথাটা ঠিক নয়।

তালাল সউদি আরবের মতো একটি রক্ষণশীল দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখান, খুতবা-নসিহা-দাওয়ার মতো ইসলামি ধারণার ভেতরে জনসমালোচনার সুযোগ রয়েছে। নসিহার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। নসিহা হচ্ছে নৈতিক সংশোধনের জন্য পরামর্শ। ধার্মিক মুসলমান ও আলেম, যাদের ধার্মিকতা ও ইলম স্বীকৃত, তারা সঙ্গী-সাথী-সহযাত্রী মুসলমানদের জন্য এটা করেন। এটা যেমন ব্যক্তিগতভাবে করা যায়, তেমনি শাসককেও করা যায়। শাসক যদি শরিয়াহ থেকে সরে আসে, সেক্ষেত্রে তাকে নসিহা বা পরামর্শ দেওয়া বিধিসম্মত। নসিহা শাসকের কর্তৃত্বাধীন বিষয় নয়।

এক্ষেত্রে ১৯৯১ সালে সউদি আলেমদের বাদশাহ ফাহাদ বরাবর নসিহার কথা উল্লেখ করা যায়। তালাল অবশ্য স্বীকার করেছেন, সউদি আরবের উত্তরোত্তর আধুনিকায়নের ফলে সেখানে নসিহার পরিসর সীমিত হয়ে আসছে। তারপরেও ইসলামের পরিসরে যুক্তি চর্চার সিলসিলা আছে— এটা তিনি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

বইটির Ploemics অংশের প্রথম প্রবন্ধের নাম Multiculturalism and British Identity in the Wake of the Rushdie Affair। সালমান রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটেনের মুসলমানরা সরকারকে বইটি নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানায়, প্রকাশক পেঙ্গুইন বুকসকে বইটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করে এবং রাজপথে এসে বইটি পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। এছাড়া কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সন্ত্রাসের কোনো ঘটনা ঘটেনি। এতেই সরকার কড়া প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মুসলমানদের ব্রিটিশ হওয়ার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, সরকার তাদেরকে ব্রিটিশ কালচার ও ব্রিটিশ পরিচয় ধারণ করার কথা বলে। তালালের কথা হলো, একদিকে বহুসংস্কৃতিবাদের কথা বলা হচ্ছে,

ডাইভারসিটি— বৈচিত্র্যের কথা বলা হচ্ছে, আবার একই সাথে ব্রিটিশ কালচার গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে— এটা কি স্ববিরোধিতা নয়? তালাল দেখান, ব্রিটিশ কালচার মানে ইংরেজ শাসকশ্রেণির ভাব-চিন্তা-কল্পনা-বিধিবিধান-মূল্যবোধ ও জীবনাচারের সমষ্টিবিশেষ। ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের পক্ষে এটার ভেতরে আত্মস্থ হওয়া কতটুকু সম্ভব? তালালের তাই সুস্পষ্ট মতামত :

> Diversity is to be tolerated only if it does not conflict with British identity, to which it is necessarily external.[১৪]
>
> [বৈচিত্র্যকে কেবল তখনই সহ্য করা হবে, যদি তা ব্রিটিশ পরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, যার প্রতি এটা অনিবার্যভাবে বাহ্যিক।]

এ প্রবন্ধে তালাল দেখান স্যাটানিক ভার্সেসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবে ব্রিটেনের ক্ষুদ্র মুসলিম সম্প্রদায় যেভাবে সংগঠিত হয়েছে, সেটাই ব্রিটিশ উদারনৈতিকদের কপালে ভাঁজ ফেলে দেয়। তাদের কল্পিত ভয়টা আইন-শৃঙ্খলার দিক দিয়ে ছিল না। এমনকি বাক্-স্বাধীনতার দিক দিয়েও নয়। বরং এটা ব্রিটিশ পরিচয় নামে যে আধিপত্যের ধারণা তৈরি হয়েছে, সেখানে একটা জায়গা করতে চেয়েছিল :

> It is a matter, rather, of the politicization of a religious tradition that has no place within the cultural hegemony that has defined British identity over the last century—especially as that tradition has come from a recent colonial society.[১৫]
>
> [এটা বরং একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের রাজনৈতিকীকরণ, যা গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে কোনো স্থান পায়নি— বিশেষভাবে যেহেতু এই ঐতিহ্যটি একটি সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক সমাজ থেকে এসেছে।]

এ প্রবন্ধে তালাল আরো কয়েকটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্রিটেনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ও রাজনৈতিক অধ্যায়ের সাথে কয়েকটা শব্দ তৈরি হয়েছে। যেমন— coloured, new commonwealth immigrants, blacks, ethnic, cultural minority। এসব শব্দ বুনিয়াদিভাবে ব্রিটিশ বা সাদা সংখ্যাধিক্যের মানুষের সাথে অভিবাসীদের একটা বিভাজন রেখা তৈরি করে। এসব শব্দের অন্তর্গত অর্থ হচ্ছে কিছু সংস্কৃতির মানুষ বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অন্যরা মানে অভিবাসীরা নয়। তাহলে ব্রিটিশ সমাজে বহুসংস্কৃতিবাদের নামে বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান দেখানোর যে দাবি করা হয়, তার ভিত্তি কী? তালালের সংগত প্রশ্ন :

> Does equal respect for cultural diversity mean the exclusion of cultural minorities from equal power?[১৬]
>
> [সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধা কি সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের সমান ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়া বোঝায়?]

রুশদির ঘটনাটা দেখিয়ে দেয় ব্রিটিশ উদারনৈতিকরা তাদের জাতিরাষ্ট্রের আদর্শিক কাঠামোর ভেতরে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের তার নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে রাজনৈতিক হয়ে উঠতে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়।

Polemics অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ এবং বইয়ের শেষ প্রবন্ধ 'Ethnography, Literature, and Politics'। এখানে তালাল রুশদির উপন্যাসের প্রেক্ষিতে দেখান— কীভাবে সাংস্কৃতিক মতলবটা রাজনৈতিক কার্যকলাপের অংশ হয়ে গেছে। পশ্চিমের ভেতরেও যে 'অপর' আছে এবং 'অপরকে' নিয়ে ভিন্নতার রাজনীতি কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের পরিসরে জায়গা নিয়েছে, তালাল সেটা খোলাসা করেছেন।

সমসাময়িক পৃথিবীতে আলোকায়নের অস্পষ্ট উত্তরাধিকার অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হয় আধুনিক রাষ্ট্রের 'মুক্তি' নামক সমসত্ত্বকরণের প্রকল্পে ঢুকে যাও, নতুবা সংখ্যালঘুরা অবমাননাকর ভিন্নতার অবস্থান কবুল করো। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে এর বুনিয়াদি মূল্যচেতনাকে (core values) গ্রহণ করা চাই। এখানকার মূল্যচেতনা হচ্ছে সাদা সংখ্যাধিক্যের ঐতিহাসিক মূল্যবোধ :

British core values appear to mean the historical values of the British majority.[১৭]

[ব্রিটিশদের মূল মূল্যবোধ বলতে ব্রিটিশ সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঐতিহাসিক মূল্যবোধকেই বোঝায় বলে মনে হয়।

এটাকে অবশ্যই আধিপত্যবাদী জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে সংখ্যালঘু অভিবাসীদের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হতে হলে এর বিকল্প থাকে না। এই নীতিকে যদি মানতে হয়, তাহলে আধুনিক রাষ্ট্রে ভিন্ন বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গের কোনো বৈধ রাজনীতি থাকার সুযোগ নেই। এই পটভূমিতে তালালের প্রশ্ন হলো নৃতাত্ত্বিকরা কি উদারনৈতিক তত্ত্ব ধরে আলাদা ও ভিন্ন ঐতিহ্যকে পাঠ করবেন অথবা ভিন্ন ঐতিহ্যকে তার জায়গায় রেখে আলোচনা করবেন?

এভাবেই তালালের বইটি শেষ হয়ে যায়। এখানে তিনি যেমন উদারনৈতিক রাষ্ট্রের অসংগতিগুলো তুলে আনেন, তেমনি উদারনৈতিক সূত্র ধরে নৃতাত্ত্বিক পাঠের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার দিকেও আমাদের ইংগিত করেন। তিনি এখানে দেখান— ধর্ম বলে একটা বর্গ কীভাবে ইউরোপে পয়দা হয়, খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য কীভাবে সুরত বদলিয়ে আধুনিক সেকুলার সুরত পায়, আবার খ্রিষ্টীয় সিলসিলার অনেক কিছু উদারনীতিবাদের অংশ হয়ে যায়। ইউরোপে ধর্মের ইতিহাসের রূপান্তরগুলোকে জিনিয়লজিক্যাল ও নৃতাত্ত্বিকভাবে তালালের মতো আর কেউ সমসাময়িক সময়ে বোঝাপড়া করতে পারেননি। তালালের এ বই ইউরোপের আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। তবে বইটি পড়লে বোঝা যায়, তালালের ধর্ম সম্পর্কে বোঝাপড়া প্রধানত খ্রিষ্টান ধর্মকে কেন্দ্র করে হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কেও এ বইতে তার কিছুটা অভিমত আছে। তবে সেটা বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি।

পাঁচ.

তালাল আসাদের দুনিয়া কাঁপানো বই *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। *জিনিয়লজিস অভ রিলিজিয়ন ও ফরমেশনস অভ দ্য*

সেকুলার— এ দুটো বইকে ধারাবাহিক রচনা বলা যায়। একটির যেখানে শেষ, আরেকটির সেখানে শুরু। জিনিয়লজিসে তালাল যা শেষ করতে পারেননি, ফরমেশনসে এসে সে অপূর্ণতা ঘুঁচিয়েছেন। জিনিয়লজিসে ধর্মের কথা আলাপ হয়েছে বেশি, ফরমেশনসে সেকুলারিজমের কথা। কারণ, একটা আরেকটার ভেতরে মিশে আছে। একটাকে ছাড়া আরেকটাকে ব্যাখ্যা করাও যায় না। তবে জিনিয়লজিতে তালালের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানটা বেশি। ফরমেশনসে বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের পাশে তার একটা নৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থান দেখা যায়।

তালাল এ বইয়ে একজন নৃবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে সেকুলারিজম ধারণার সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বইটি শুরু করেছেন এভাবে : What Might an Anthropology of Secularism Look Like? এখানে তিনি সেকুলারিজমের নৃতত্ত্বকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সেকুলারিজমের ধারণা, চর্চা ও রাজনৈতিক গঠনকে তুলে এনেছেন এবং একই সাথে ইতিহাসের যে বাঁকগুলো সেকুলার চেতনা ও মনোভঙ্গিকে নির্মাণ করেছে, তার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তালাল এ বইতে সেকুলারিজম নিয়ে যে বিশ্বাসগুলো জনপরিসরে হাজির আছে, তার প্রকৃত চেহারাকে অনাবৃত করেছেন। তার কথা হচ্ছে, নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণত অ-ইউরোপীয়, অ-পশ্চিমা দেশের 'অজানা বিস্ময় নিয়ে' পুলক অনুভব করে এবং সেটাকে সেসব দেশের সামাজিক জীবনের অযৌক্তিক মাত্রা হিসেবে শনাক্ত করে, যেমন— মিথ, ট্যাবু ও ধর্ম। কিন্তু তালালের কথা হলো, যেভাবে এরা ধর্মকে নিয়ে পর্যালোচনা করে, ঠিক সেভাবে আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেখা হয় না। তালাল এ বইতে সে কাজটি করেছেন। সেই জায়গা থেকে এ বইটিকে অ্যানথ্রোপলজি অভ সেকুলারিজম বলা যেতে পারে।

তালালের এ বইটি একটি মূল্যবান ভূমিকাসহ সাতটি প্রবন্ধের সংকলন। এ প্রবন্ধগুলো তিনটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম সেকুলার (Secular), দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সেকুলারিজম (Secularism) ও তৃতীয়টি হলো সেকুলারাইজেশন (Secularization)। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি করে প্রবন্ধ ও

শেষটিতে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। এই তিনটি শিরোনামের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য আছে, যার ভেতর দিয়ে তালাল তার ধারণাগুলোকে বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক বর্গ হিসেবে সেকুলার, রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে সেকুলারবাদ, আর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে সেকুলারায়ন— এ তিনের সম্পর্ক তিনি আমাদের দেখান।

সেকুলার বলতে তালাল সেসব কনসেপ্ট, আইডিয়া, ক্যাটাগরিকে বুঝেছেন, যা ধীরে ধীরে সময়ের যাত্রায় একত্রে মিলেমিশে সেকুলার নামক একটি ধারণায় পরিণত হয়। তখন এটাকে তিনি বলেন The Secular। অ্যাডজেক্টিভ সেকুলারের আগে তিনি The শব্দ বসিয়ে এটাকে নাউনে পরিণত করেন এবং এর একটি বিশেষ তাৎপর্য দেন। তালালের মতে কনসেপ্ট (ধারণা) যেমন বিশ্বজনীন নয়, তেমনি এটা কোনো দ্বান্দ্বিকতার ফল নয়। কনসেপ্ট আরো বহু কনসেপ্টের সাথে সমন্বিত হয় এবং এই জোড় অন্যান্য চর্চার সাথে যুক্ত হয়ে একটি শক্তিশালী রূপ নেয়, যা জীবনের বিভিন্ন রূপের সাথে মিশে যায় এবং বারংবার বদলাতে থাকে। তালাল এই জোড়গুলো খুলে খুলে দেখান, যা 'সেকুলার' তৈরি করে এবং ধারণা হিসেবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এ বই 'সেকুলার' ধারণাকে খুলে দেখার ইতিবৃত্ত।

তালাল মনে করেন ধারণাগতভাবে 'দ্য সেকুলার' সেকুলারিজমের আগে অবস্থান করে। যেমন— জাতিরাষ্ট্রের আগে এনলাইটেনমেন্টের অবস্থান। সেকুলারিজম হচ্ছে একটা রাজনৈতিক আদর্শ, রাষ্ট্র নির্মাণের প্রকল্প বা শাসনপদ্ধতি। কখনো কখনো আধিপত্যবাদী ধারণাও বটে। অন্যদিকে দ্য সেকুলার হচ্ছে একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্যাটাগরি। তালালের লেখায় বারবার আধুনিকতা, সেকুলারিজম, জাতিরাষ্ট্র শব্দগুলো ঘুরে-ফিরে আসে, যেহেতু এই ধারণাগুলোর তিনি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে বসেছেন। আধুনিকতা চায় সেকুলারিজম, সেকুলারিজম চায় জাতিরাষ্ট্র। এসব শব্দ ধারণার দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে মিশে থাকে, যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন সত্তা।

সেকুলারাইজেশন বা সেকুলারায়ন হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া, যার ভেতর দিয়ে সেকুলারিজম রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে সমাজে গৃহীত হয় ও জাতিরাষ্ট্র তৈরির পথ সুগম হয়।

তালাল এ বইতে তার যুক্তিগুলোকে শক্তভাবে হাজির করেন। তার প্রবন্ধগুলো অ্যাকাডেমিকভাবে লেখা। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, এ বই লেখার সময় বিচিত্র বিষয়কে তিনি হাজির করেছেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞানের মতো নানা বিষয়ের মিশেল দিয়ে ধর্ম ও সেকুলারিজমকে পর্যালোচনামূলকভাবে বোঝার জন্য এ বই অনেকের কাজে লাগতে পারে। এ কারণেই হয়তো তিনি ধর্ম ও সেকুলারিজম উভয়কে কনসেপ্ট আকারে দেখেছেন। তার ভাষায় :

> The important thing in this comparative analysis is not their origin (Western or non-Western), but the forms of life that articulate them, the powers they release or disable. Secularism— like religion— is such a concept.[১৮]
>
> [এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের পশ্চিমা বা অ-পশ্চিমা উৎস নয়, বরং তাদের প্রকাশিত জীবনরূপ— তারা যে ক্ষমতা উন্মোচন করে বা নিষ্ক্রিয় করে। ধর্মনিরপেক্ষতা— ধর্মের মতোই— তেমনই একটি ধারণা।]

কেননা, এ দুটো কনসেপ্টই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও কাঠামো তৈরি করে এবং ভিন্ন ভিন্ন চেতনা ও শক্তির জন্ম দেয়।

তালাল তার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, তিনি এ বইটি লেখার সময় জিনিয়লজিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এ পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন দার্শনিক নিটশে ও মিশেল ফুকো। তিনি তার ভূমিকায় এদের প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। হয়তো এসব কারণে তালালকে নিটশিয়ান বা ফুকাল্ডিয়ান হিসেবেও শনাক্ত করা হয়। নিটশে বা ফুকো উভয়ে ছিলেন এনলাইটেনমেন্টের সন্তান। কিন্তু এনলাইটেনমেন্টজাত আধুনিকতার ধারণার ভেতরে যে অনেক সীমাবদ্ধতা ও অসংগতি আছে, তার দিকে এরা আমাদের নজর কেড়েছেন। এরা এনলাইটেনমেন্টের সন্তান বটে, তবে বিদ্রোহী সন্তান। এদের সিলসিলা ধরে তালাল কতকটা এগিয়েছেন বলা যায় এবং আধুনিকতা ও সেকুলারিজমের ধারণাকে সমস্যায়িত, অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। এদিক দিয়ে

তালালের চিন্তাটা প্রথাগত এনলাইটেনমেন্টের বুদ্ধিজীবীদের মতো না হলেও, মূলে পশ্চিমকেন্দ্রিক চিন্তাকাঠামোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি যেসব টুলস— হাতিয়ার ব্যবহার করে আধুনিকতার সমালোচনা করেছেন, সেগুলো গোড়ায় পশ্চিমেরই টুলস। সেদিক দিয়ে চিন্তা করে তালালের আলোচনাকে আমরা Secular critique of the secular হিসেবে শনাক্ত করতে পারি। এটাকে সেকুলারিজম নিয়ে তালালের এক ধরনের আত্মসমালোচনা বলা যেতে পারে।

তালাল তার বইটিতে ১৭ পৃষ্ঠার একটা ভূমিকা লিখেছেন। এটাকে নিছক ভূমিকা না বলাই ভালো। এটা রীতিমতো একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হয়ে গেছে, যেটিকে বইয়ের অন্যান্য লেখার সাথে মিলিয়ে পড়লে সেকুলারিজমের সমস্যাগুলো বোঝার সবচেয়ে সুবিধা হয়। তালাল এই ভূমিকায় আধুনিক জাতিরাষ্ট্রকে সবার প্রবেশাধিকারভিত্তিক সমাজ বলে যে আদর্শায়ন করা হয়, তার বৈধতা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তিনি দেখান, আজকালকার উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ভোটার ও সংসদ সদস্যদের ভেতরে দূরত্ব অনেকদূর বেড়ে গেছে। এর ফলে ভোটারদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ, আত্মপরিচয় এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মেরুকরণকৃত ভোটারদের আকাঙ্ক্ষা সংসদে প্রতিফলিত হয় না। তালাল তাই যথার্থ প্রশ্ন তোলেন :

> The ordinary citizen does not participate in the process of formulating policy options as these elites do—his or her participation in periodic elections does not even guarantee that the policies voted for will be adhered to.[১৯]
>
> [সাধারণ নাগরিক নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় এই অভিজাতদের মতো অংশগ্রহণ করে না— এমনকি পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতও করে না যে, নির্বাচিত নীতিগুলো মেনে চলা হবে।]

তালাল আরো দেখান আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মের অবস্থান বিভিন্ন রকম। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ধর্ম জনপরিসরে থাকে। ফ্রান্সে কিছুটা সীমিত। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনপরিসরে অংশগ্রহণের মাত্রার ভেতরেও

ভিন্নতা আছে। জাতি, রাষ্ট্র কার্যত উদার নয় এবং এর আইনকে প্রতিষ্ঠা করতে সহিংসতারও প্রয়োজন হয়। সেকুলারিজম তাই শান্তির কথা বললেও শান্তির নিশ্চয়তা তৈরি করতে পারেনি। তালালের মতে ধর্মের সহিংসতা এখন রাষ্ট্রের সহিংসতায় পরিণত হয়েছে। তার মন্তব্য :

> A secular state does not guarantee toleration; it puts into play different structures of ambition and fear. The law never seeks to eliminate violence since its object is always to regulate violence.[২০]
>
> [একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সহনশীলতার নিশ্চয়তা দেয় না; এটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভয়ের ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোকে সক্রিয় করে তোলে। আইন কখনোই সহিংসতাকে দূর করতে চায় না, কারণ এর উদ্দেশ্য সর্বদা সহিংসতাকে নিয়ন্ত্রণ করা।]

তালাল এরপরে বাইবেলের আলোচনা করে দেখান বাইবেলকে পবিত্র হিসেবে দেখানোটা আসলে আঠারো শতকে অতিরিক্ত ফিকশন পড়ার ফল। তার প্রশ্ন হলো, তাহলে সাহিত্য ও পবিত্র পাঠের ভেতরে তফাৎ করল কে? তার মত হলো, সেকুলারিজম সাহিত্য ও পবিত্র টেক্সটের ভেতরে এই বিভাজন রেখা এঁকেছে, যেমন এটা ব্যক্তি ও জনের মধ্যে তফাৎ তৈরি করেছে। তালাল প্রশ্ন করেন, তাহলে মুসলিম রচিত সাহিত্যগুলো কি কুরআনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনে চলবে? তিনি বলতে চান, সেকুলারিজম তার কনসেপ্টগুলোর মধ্যে এক ধরনের দ্বিপ্রান্তিকতা— বাইনারি তৈরি করে। এই বাইনারি তৈরি সেকুলারিজমের একটা বৈশিষ্ট্য এবং এর ভেতর দিয়ে সেকুলারিজম তার চিন্তাপদ্ধতি বা কাঠামোকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তালালের ভাষ্য এরকম :

> I take the secular to be a concept that brings together certain behaviors, knowledges, and sensibilities in modern life ...
>
> In my view the secular is neither singular in origin nor stable in its historical identity, although it works through a series of particular oppositions ...[২১]

[আমি 'ধর্মনিরপেক্ষ' ধারণাটিকে এমন একটি বিষয় হিসেবে দেখি, যা আধুনিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ, জ্ঞান এবং সংবেদনশীলতাকে একত্রিত করে ...

আমার মতে, ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস একক নয় এবং এর ঐতিহাসিক পরিচিতি স্থিতিশীল নয়, যদিও এটা বেশ কিছু নির্দিষ্ট বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কাজ করে ...]

তালাল দেখান— মিথ বনাম সেকুলারিজম, বিশ্বাস বনাম জ্ঞান, যুক্তি বনাম কল্পনা, ইতিহাস বনাম কল্পকাহিনি, প্রতীক বনাম রূপক, প্রাকৃতিক বনাম অতিপ্রাকৃতিক, পবিত্র বনাম অপবিত্র— এরকম দ্বিপ্রান্তিকতা সেকুলার বয়ানের ভেতরে ছড়িয়ে আছে। তার কথা হলো, এরকম বিভাজন প্রাক-আধুনিক যুগে তেমন দেখা যায় না :

The supposedly universal opposition between 'sacred' and 'profane' finds no place in premodern writing. In medieval theology, the overriding antinomy was between 'the divine' and 'the satanic' (both of them transcendent powers) or 'the spiritual' and the 'the temporal' (both of them worldly institutions), not between a supernatural sacred and a natural profane.[২২]

[কথিত 'পবিত্র' এবং 'অপবিত্র'-এর সর্বজনীন বিরোধিতা প্রাক-আধুনিক লেখায় স্থান পায়নি। মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বে প্রধান বৈপরীত্য ছিল 'ঐশ্বরিক' এবং 'শয়তানি'-এর মধ্যে (উভয়ই অতীন্দ্রিয় শক্তি) অথবা 'আধ্যাত্মিক' এবং 'পার্থিব'-এর মধ্যে (উভয়ই জাগতিক প্রতিষ্ঠান), কোনো অতিপ্রাকৃত পবিত্র এবং প্রাকৃতিক অপবিত্রের মধ্যে নয়।]

সেকুলারিজম এই দ্বিপ্রান্তিকতার সীমারেখা দাঁড় করালেও, তালাল দেখান বাস্তবে এগুলো একটি আরেকটিকে ওভারল্যাপ করে, একটি আরেকটির মধ্যে মিশে থাকে— সব কিছু সাদা-কালো এই দ্বিমাত্রা দিয়ে বিচার করা চলে না।

তালাল এই দ্বিপ্রান্তিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। দ্বিপ্রান্তিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক— এই বিভাজন রেখা এবং এটার ওপর ভিত্তি করে সেকুলারিজমের জ্ঞানগত জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই দ্বিপ্রান্তিকতার অর্থ একটা আরেকটার ভেতরে স্থানান্তরিত হয়। যেমন— 'সেক্রেড' শব্দটা প্রাক-আধুনিক। কিন্তু সেকুলারিজম এটাকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছে এবং চার্চের সম্পত্তিমুক্ত হওয়ার পর ব্যক্তির ওপর আরোপ করে বলা হচ্ছে sacred write to property। ঠিক একইভাবে পরাজাগতিক কর্তৃত্বকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানুষের বিবেকের পবিত্রতার কথা। এটাকে বলা হয় migration of the holy। চার্চের পবিত্রতা ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের ভেতরে চলে যাওয়া। পবিত্র ব্যাপারটা তাই চলে গেল না, সেকুলার পরিসরে এর একটা নতুন বন্দোবস্ত হলো।

তালাল আরবি কবিদের উদাহরণ দিযে বলেছেন, এরা প্রাক-আধুনিক মিথ শব্দকে আধুনিকায়িত করেছে। কবি এডোনিসের নজির দিয়ে তালাল দেখান, তিনি ইসলামি নন্দনতত্ত্বকে মোকাবিলা করার জন্য মিথের আধুনিক ব্যবহার হাজির করেন। এডোনিস মানবের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও পরাজাগতিক কর্তৃত্বকে সঙ্কুচিত করার জন্য মিথকে কবিতায় নিয়ে আসেন। তার আগ্রহের জায়গা হচ্ছে যুক্তি এবং সেই যুক্তি দিয়ে তিনি মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করেন। এভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব মানুষের ওপর আরোপিত হয়। সেকুলারিজমের করুণায় ধর্মের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে পরিণত হয়। আধুনিক রাষ্ট্র হয় নতুন ধর্ম এবং এই ধর্মের অনুসারীরা হয় রাষ্ট্রের অনুগত, একধরনের নিস্তেজ নাগরিক। এভাবে সেকুলারিজম একটা নতুন ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। তালাল তাই উল্লেখ করেন :

> But an atheism that deifies Man is, ironically, close to the doctrine of the incarnation.[২৩]
>
> [কিন্তু মানুষকে দেবত্ব প্রদানকারী নাস্তিকতা— বিদ্রুপাত্মকভাবে— অবতারবাদের ধারণার কাছাকাছি।]

এরপরে তালাল দেখান, সেকুলারিজম নিজেকে ভিত্তি হিসেবে দেখতে পছন্দ করে এবং সব কিছুকে নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত করে।

নিজের বাইরের সীমানার সব কিছুকে সে False consciousness— অলীক চেতনা হিসেবে শনাক্ত করে। আধুনিক কালে ধর্মকে আমরা যেভাবে দেখি, সেটা সেকুলারিজমের আবিষ্কার। সেকুলারিজম ধর্ম, এথিকস ও রাজনীতির সংজ্ঞাই পাল্টে দিয়েছে। সেকুলারিজম নিজেই ধর্মের সংজ্ঞা দেয়। কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম বলে দেয়। ধর্মের কোন অংশ সমর্থন করা যাবে, কোন অংশ যাবে না, তা-ও ঠিক করার দায়িত্ব সেকুলারিজমের। শুধু তাই নয়, কোনটা ধর্ম, আর কোনটা সংস্কৃতি— এটা ঠিক করার দায়িত্বও তার। এ-কারণেই পশ্চিমে হিজাব হয়ে যায় ধর্ম, আর ক্রস হয়ে ওঠে সংস্কৃতি। আমাদের দেশেও আজকাল এই প্রবণতার কারণে মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল হয়ে যায় ধর্ম, আর কীর্তন, হোলি খেলা হয়ে ওঠে সংস্কৃতি। সেকুলারিজম ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম-সমাজকে নিজেদের আধুনিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার, বিকৃত ও নির্মাণ করে। সেকুলারিজম ধর্মের একটা টলারেন্ট, প্যাসিভ চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করে। কেননা, ধর্মের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক রূপকে সেকুলারিজমের খুব না-পছন্দ। কারণ, এটা সেকুলারিজমের জ্ঞানগত ধারাকে মোকাবিলা করে। এই কারণে আমাদের দেশের সেকুলারবাদীদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে সুফি ইসলাম, তাবলিগি ইসলাম। কারণ, এগুলো তাদের সরাসরি জ্ঞানগত রাজনৈতিক অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে না।

সেকুলারিজম বাইনারি— দ্বিপ্রান্তিকতা উৎপাদন করে ব্যক্তি ও জনপরিসর সৃষ্টি করেছে। তারপরে ধর্মকে ব্যক্তি পরিসরে ঢুকিয়ে দিয়ে জনপরিসর থেকে একে বহিষ্কার করেছে। ধর্ম যে ব্যক্তিগত ব্যাপার— এটাও সেকুলারিজমের উদ্ভাবন। তালাল এখানে প্রশ্ন করেন, তাহলে রাষ্ট্র তার আইন-কানুনের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরে যখন ঢুকে যায়, অন্যদিকে ধর্মকে জনপরিসরে আসতে দেওয়া হয় না, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি ও জনের সীমানার পরিসর অস্বচ্ছ হয়ে যায় কিনা? তালাল অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেন না। উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন উসকে দেয়াই তার কাজ।

সেকুলার অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবন্ধের নাম হলো Thinking about Agency and Pain এবং Reflections on Cruelty and Torture। তালালের লেখালেখিতে যন্ত্রণা একটা দার্শনিক রূপ পেয়েছে। ধর্ম ও সেকুলারিজমের ভেতর দিয়ে যন্ত্রণা বৈচিত্রময় তাৎপর্য

লাভ করেছে— তিনি আমাদের এটা দেখিয়েছেন। এ লেখায় তালাল এজেন্সি (কর্তাসত্তা), পেইন (যন্ত্রণা), ক্রুয়েলটি (নিষ্ঠুরতা), টরচার (নির্যাতন)-এর ভেতর দিয়ে সেকুলারিজমকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রাক-আধুনিক যুগে এগুলো কীভাবে ছিল এবং আধুনিক যুগে এটা কীভাবে হাজির হয়েছে, সেটা দেখানো তার উদ্দেশ্য। তালাল এজেন্সির একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

> Agency means the self-ownership of the individual.[২৪]
>
> [এজেন্সি মানে ব্যক্তির আত্ম-মালিকানা।]

ব্যক্তির নিজ সিদ্ধান্ত ও সে মোতাবেক চলার বা করার অধিকারকে কর্তাসত্তা বলে। এখন তালালের কথা হলো পেইন, টরচার, ক্রুয়েলটি ইত্যাদি আমাদের এজেন্সিকে সীমিত করে। কারণ, ধর্ম সহিংস ও রক্তাক্ত ব্যাপার। পশ্চিমের ক্রিশ্চিয়ানিটি তার নজির। সেকুলারিজম এ সহিংসতাকে দূর করার কথা বলে, নিরপেক্ষতার কথা বলে। তালাল যুক্তি দেন, লিবারেল যুগে এসে সহিংসতা তো দূর হলো না, উল্টো সহিংসতার আইনি ভিত্তি দাঁড় করানো হলো, সহিংসতার মানবীকিকরণ করা হলো। প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের জায়গায় জেলে পাঠানো হলো। সহিংসতাকে দৃশ্যমানতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। সহিংসতা জাতিরাষ্ট্রের বিদ্রোহী নাগরিক, অ-নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য হলো এবং এই সহিংসতাকে জাতিরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য উপকারী হিসেবে দেখানো হলো। তেমনি আধুনিক যুদ্ধের আধুনিক ধ্বংসকামিতাকেও জাতিরাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণকামিতার পক্ষে বলে তত্ত্বায়ন করা হলো।

তালাল অবশ্য এ কথাও যোগ করেন— কালোদের ওপর সাদাদের জুলুম লিবারেল ইতিহাসে অনুল্লেখিত থাকে। এভাবে সেকুলারিজম নতুন ধরনের পেইন সৃষ্টি করে। এর হাতে পেইনের নবনির্মাণ ঘটে। তালালের কথায়— মানুষের জীবন পবিত্র বটে, কিন্তু যতক্ষণ এটা জাতিরাষ্ট্রের সংজ্ঞানুসারে হয়। সেকুলারিজমের ভাষ্য— পেইনের ভেতরে এজেন্সি থাকে না— কথাটা কতটুকু সঠিক? তালাল দেখান, সন্তান জন্ম দেওয়ার বেদনা একটা এজেন্সির বেদনা। এটা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। ধর্মের জন্য শহিদ হওয়ার বেদনাও এজেন্সির

বেদনা। যিশুর ক্রসে আত্মাহুতি দেওয়ার বেদনাও একটা এজেন্সির বেদনা। ইসলামে সবরের যে বেদনা, তা-ও একটা এজেন্সির বেদনা। এভাবে দেখলে দেখা যায়, ধর্মের জায়গা থেকে যেটা এজেন্সি, সেটা সেকুলারিজমের জায়গা থেকে এজেন্সিহীনতা। আবার পশ্চিমে কোনো কোনো সহিংসতাকে গ্রহণ করা হলো, কোনোটিকে হলো না। যেমন— পশুদের ওপর করা সহিংসতাকে পশ্চিম মেনে নিয়েছে। তালাল এভাবে সেকুলারিজমের অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতাকে খুলে খুলে দেখান। তিনি এভাবে সব কিছুকে অনাবৃত করে দেন।

এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সেকুলারিজম। এর প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম Redeeming the 'Human' through Human Rights। তালাল এ প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে প্রশ্ন করেন, মানব অধিকারের ধারণা ঠিক কোন মানবকে মুক্ত করে বা অধিকার দেয়? এ প্রবন্ধ তিনি শুরু করেছেন সোমালিয়ায় মার্কিন বিমান হামলার ঘটনায় প্রচুর নিরীহ মানুষের হতাহতের ঘটনা দিয়ে। এটাকে তখন বলা হয়েছিল collateral damage— যাকে সাধারণত মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে শনাক্ত করা হয় না। আন্তর্জাতিক আইনে এই ধরনের মানবসত্তার লঙ্ঘন বা ক্ষতিকে বেআইনি হিসেবে দেখা হয় না। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি একটা দেশের নাগরিক হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাথে মানুষ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভেতরে তফাৎ আছে। মানবাধিকারের ধারণা ব্যক্তি মানব হওয়ার সাথে জড়িত, নাগরিক হিসেবে নয়। এক্ষেত্রে তালাল একটা প্যারাডক্স— কূটাভাস দেখতে পান। যে জন্মগত অধিকার মানুষকে সংজ্ঞায়িত করে, তা জাতিরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে না। কারণ, এটা একটা প্রাকৃতিক অবস্থা (state of nature)। কিন্তু নাগরিকের ধারণা, নাগরিক অধিকারের ধারণা জাতিরাষ্ট্রের বিষয়। আলোকায়নের বুদ্ধিজীবীরা যাকে বলেছেন রাজনৈতিক সমাজ। নৈতিক আইনসহ মানবাধিকারের ধারণা, যা বিশ্বব্যাপী মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তা সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব মানুষের অন্তর্গত বিষয়। কিন্তু তারপরেও মানবাধিকার আইনের প্রয়োগ জাতিরাষ্ট্রের আইনি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান নিদান হিসেবে যা করে, তা ব্যক্তির নাগরিক সত্তা হিসেবে প্রয়োগ করে। এভাবে তালাল মানব হিসেবে অধিকারের

যেমন পর্যালোচনা করেন, তেমনি তার স্বাধীনতার ধারণা নিয়েও আলোচনা করেন। একসময় পশ্চিমে স্বাধীনতাকে সম্পত্তি হিসেবে দেখার রেওয়াজ চালু হয়েছিল। সম্পত্তি হলে সেটা কেনাবেচা করা যায়। স্বাভাবিক কারণে, দাস মালিকরা এই নীতির সমর্থক ছিল। এই নীতির ভিত্তিতে বলা যায়, কিছু মানুষ অসভ্য-অনুন্নত, আর কিছু মানুষ সভ্য-উন্নত। সুতরাং, অসভ্যদের ওপর সিভিলাইজিং মিশন চালানো যথার্থ। এভাবে গড়ে উঠল এনস্লেভমেন্ট, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদের ধারণা। এনস্লেভমেন্টকে উপনিবেশবাদের চেয়ে ভালো বলা হলো। কারণ, এনস্লেভমেন্ট ব্যক্তিগত বিষয়, আর উপনিবেশবাদ সামষ্টিক বিষয়— যার ভেতরে সিভিলাইজিং— সভ্যকরণের একটা ইঙ্গিত আছে। এভাবে তালাল এ অধ্যায়ে মানবাধিকার ধারণার কীভাবে বিকাশ হলো, জন লক, হবস, ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকার ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিল অভ রাইটস, জাতিসংঘের মানবাধিকার ধারণাকে পর্যালোচনা করেন এবং শেষমেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিংয়ের নাগরিক অধিকার আন্দোলন ও ম্যালকম এক্সের মানবাধিকার আন্দোলনের একটা তুলনামূলক আলোচনাও আনেন। এসবের ভেতর দিয়ে তিনি মানবাধিকার ধারণার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি আমাদের সামনে উন্মোচন করেন।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম Muslims as a 'Religious Minority' in Europe। এই প্রবন্ধের শুরুতেই তালাল বলেন, ইউরোপে মুসলমানরা আছে আবার নেই। এই পরিস্থিতির কারণ ইউরোপ নামক ধারণা, যে ধারণার ভেতরে সেখানকার 'সংস্কৃতি', 'সভ্যতা', 'সেকুলার রাষ্ট্র', 'সংখ্যাগুরু', 'সংখ্যালঘুর' ধারণা বিকশিত হয়েছে। তালালের কথা হলো :

> Europe (and the nation-states of which it is constituted) is ideologically constructed in such a way that Muslim immigrants can not be satisfactorily represented in it.[২৫]
>
> [ইউরোপ এবং এর অন্তর্ভুক্ত জাতিরাষ্ট্রসমূহ এমনভাবে আদর্শগতভাবে গঠিত হয়েছে যে, মুসলিম অভিবাসীরা এতে সন্তোষজনকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।]

ইউরোপ একটা আইডিয়া। এটা একটা ভূখণ্ডকেন্দ্রিক ধারণা। অন্যদিকে ইউরোপ একটা সভ্যতাকেন্দ্রিক বয়ানও। এক্ষেত্রে ভূখণ্ডের ভেতরে রাশিয়াকে রাখা হয়। কিন্তু সভ্যতার জায়গায় রাশিয়া বাদ। ভূখণ্ডের জায়গায় স্পেন অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সভ্যতার জায়গায় আরব-স্পেন গরহাজির। এই যুক্তি ধরে তালাল বলেন, তুরস্ক ইউরোপীয় কমিউনিটির সদস্য হতে পারে না। একজন জার্মান কূটনীতিকের বরাতে তিনি বলেন :

> Turkish membership would dilute the E.C.'s Europeanness.[২৬]
>
> [তুরস্কের সদস্যপদ ইউরোপীয় কমিশনের ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যকে লঘু করে দেবে।]

তালাল আরো যোগ করেন, তুরস্ককে নিয়ে ইউরোপের সন্দেহ তার খ্রিষ্টান ইতিহাসের সাথে জড়িত, যেখানে তুরস্ক ও ইউরোপ বরাবর মুখোমুখি হয়েছে, যার দ্বারা ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইন নির্মাণও প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু ইউরোপ সেই পুরোনো পরিচয়বাদী ধারণাকে আধুনিক সেকুলার ভাষায় অ-ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে এখন হাজির করেছে। তাহলে ইউরোপের ধারণা কীভাবে নির্মিত হয়েছে, তালাল মাইকেল উইন্টেলের বরাতে লিখেছেন :

> The key influences on European experience, Wintle continues, are the Roman Empire, Christianity, the Enlightenment, and industrialization. It is because these historical moments have not influenced Muslim immigrant experience that they are not those whose home is Europe. These moments are precisely what others have designated 'European civilization', a notion that takes 'Europe' to be a subject of civilization and not merely a natural territory.[২৭]
>
> [উইনটেল আরো বলেন, ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার মূল প্রভাবগুলো হলো রোমান সাম্রাজ্য, খ্রিষ্ট ধর্ম, আলোকায়ন এবং

শিল্পায়ন। মুসলিম অভিবাসীদের অভিজ্ঞতায় এই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোর প্রভাব না থাকায় তারা ইউরোপকে নিজেদের বাড়ি মনে করে না। এই মুহূর্তগুলোকেই অন্যরা 'ইউরোপীয় সভ্যতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন— এমন একটি ধারণা যা 'ইউরোপকে' কেবল একটি প্রাকৃতিক ভূখণ্ড হিসেবে না দেখে সভ্যতার একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করে।]

যেহেতু মুসলমানরা ইউরোপের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোর ভেতর দিয়ে যায়নি, তাই তারা ইউরোপীয়তার দাবি করতে পারে না। এই ব্যাপারে উদারনৈতিক ও ডানেরা মোটামুটি একমত। তারা ইউরোপে নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে বটে, কিন্তু মুসলমান হিসেবে পারবে কিনা এই মামলা এখনো ডিসমিস হয়নি। তাহলে দেখা গেল, ইউরোপের উদারনৈতিকতা কোনো ইতিহাসবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সেক্ষেত্রে, এ অবস্থাকে মুসলমানদের সহ্য করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের সাথে সহাবস্থান 'আমরা' ও 'তারার' ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তালাল তাই যথার্থ বলেন :

> The ideology of political representation in liberal democracies makes it difficult if not impossible to represent Muslims as Muslims.[২৮]
>
> [উদার গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের আদর্শ মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করাকে কঠিন, এমনকি অসম্ভবও করে তোলে।]

এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্রবন্ধের নাম Secularism, Nation-state, Religion। এই প্রবন্ধটাকে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধের সাথে সম্পূরক হিসেবে দেখানো যেতে পারে। এখানে তালাল তার ধারণাকে আরো সম্প্রসারিত করে বলেছেন, আধুনিক সমাজে ব্যক্তি ও জনপরিসর তৈরি করা হলেও জাতি-রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব ব্যক্তি পরিসরকেও নির্বিঘ্ন থাকতে দিচ্ছে না। তাহলে ব্যক্তি পরিসরে ধর্মের প্রভাব নিয়ে এত ভয় কীসের? এটা এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়— সেকুলার আইন ব্যক্তিসত্তা বিকাশ ও রক্ষার সুযোগ দেয়, ধর্ম এটাকে আবদ্ধ ও প্রভাবিত করে।

সেকুলারিজম নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। জনপরিসরে নিরপেক্ষতার কথা বলে সে এই পরিসর পুরোটাই দখল করে ফেলেছে এবং অন্যের জন্য কোনো জায়গা রাখেনি। সেকুলারিজম নিজেই যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বৈশ্বিক যুক্তির আধার মনে করে, তাহলে জনপরিসরের প্রয়োজন আছে কি? তাহলে সেটা তো একটা গোত্রবাদের মতো বিষয় হয়ে উঠল।

এরপরে তালাল প্রশ্ন তোলেন— জাতীয়তাবাদকে কি আমরা সেকুলার ধর্ম হিসেবে ভাবতে পারি? জুলিয়ান হাক্সলির বরাতে তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে উঠে আসা ধর্মের চূড়ান্ত স্তর। যেমন— নাজিবাদ ও কমিউনিজম। কারণ, ধর্মের মতো এর ভেতরেও সহিংসতার দিক আছে।

ক্লিফোর্ড গির্টজের বরাতে তিনি লেখেন, জাতিরাষ্ট্রে শীর্ষ নেতার ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়। জাতীয় আইকন— প্রতীককে তুলে ধরা হয়। এখানে তীর্থস্থান থাকে এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলোকে এক ধরনের পবিত্রতা দেওয়া হয়। গির্টজের সাথে পুরোপুরি একমত না হয়েও তালাল ধর্মের সাথে জাতীয়তাবাদের সাদৃশ্যকে একেবারে অস্বীকার করেননি। উল্টো কার্ল স্মিটের বরাতে তিনি আবার বলছেন, আজকের আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা ও তত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের সেকুলার রূপ মাত্র। এখানেও তালালের কিছুটা ভিন্নমত আছে। তারপরেও বলতে হবে, জাতীয়তাবাদের একটা ধর্মীয় উৎস তো রয়েছে।

একই প্রবন্ধে তিনি আবার প্রশ্ন করেন, ইসলামপন্থাকে কি জাতীয়তাবাদ বলা যায়? তালাল লিখেছেন, ইসলামপন্থার সাথে জাতীয়তাবাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। জাতীয়তাবাদকে ইতিহাস ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্যদিকে ইসলামি উম্মাহকে ব্যাখ্যা করতে হলে কুরআন ও হাদিস দরকার।

এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ের নাম সেকুলারইজেশন এবং এ অধ্যায়ের একটি মাত্র প্রবন্ধের নাম Reconfigurations of Law and Ethics in Colonial Egypt। এ প্রবন্ধে তালাল মিশরি আইন ব্যবস্থার সেকুলারায়নের ধাপগুলো দেখান। ঔপনিবেশিক শক্তি সবসময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করার জন্য উপনিবেশিত দেশের আইন ও নৈতিক অবস্থা বদলে ফেলে। এভাবে সেখানকার

ভূমি আইন, ফৌজদারি আইন, দেওয়ানি আইনকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় এবং পূর্বেকার শরিয়াহ আদালতের পরিধিকে সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়। শুধু তাই নয়, এটাকে আধুনিক আমলাতান্ত্রিক প্যাঁচের মধ্যে বেঁধে ফেলে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত জামাল আবদুল নাসেরের সময় এটা তুলে দিয়ে সেকুলারায়নের ষোলকলা পূর্ণ করা হয়।

এসব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীরা তাদের পুরোনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে ওয়াকফ সম্পত্তির রেওয়াজ ছিল। ধনী মুসলমানরা মানবকল্যাণের জন্য নিজেদের সম্পত্তি ওয়াকফ করতেন। অন্যদিকে ইউরোপে চার্চের জমি দখলের ইতিহাস ছিল। উপনিবেশবাদীরা মনে করেছিল এসব সেরকম কোনো ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তারা ওয়াকফ সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। এই ইউরোপীয় অনুকরণের কারণ হিসেবে মিশরীয় আইনবিদ তারিক আল-বিশরির বরাতে তালাল লেখেন :

> Mimicry of the West was the outcome of a combination of circumstances, chief among them European coercion and the Egyptian elites infatuation with European ways.[২৯]
>
> [পশ্চিমা অনুকরণ ছিল পরিস্থিতির এক সম্মিলিত ফল, যার মধ্যে প্রধান ছিল ইউরোপীয় জবরদস্তি এবং মিশরীয় অভিজাতদের ইউরোপীয় জীবনধারার প্রতি মুগ্ধতা।]

এ প্রবন্ধে তালাল একটা চমৎকার জিনিস উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখান, আধুনিক রাষ্ট্র কীভাবে সেখানকার পারিবারিক আইনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্র আইন তৈরি করলেও পরিবার তৈরি করে নৈতিকতা। সেই জায়গায় আধুনিক রাষ্ট্র হাত দিতে চেয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের পছন্দ monogamous nuclear family। যৌথ পরিবার নয়। কারণ, একক পরিবারে রাষ্ট্রের নৈতিকতা চাপিয়ে দেওয়া সহজ। এভাবে তালাল দেখান, আধুনিক রাষ্ট্র ফ্রিডম ব্যাপারটা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তা প্রাক-আধুনিক ব্যবস্থায় ছিল না। যদিও আধুনিকতা তার আবির্ভাব মুহূর্তে ফ্রিডমের কথাটাই সবচেয়ে বেশি বলেছে।

তালাল একজন খাঁটি নৃতাত্ত্বিকের মতো এ কিতাবে সেকুলারিজমের ময়না তদন্ত করেছেন। এটা আমাদের স্পষ্ট হওয়া দরকার— এ কাজটা তিনি ধর্মনেতার জায়গা থেকে করেননি। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতাগুলো কীভাবে হাজির থাকে, কীভাবে এগুলো ব্যক্তি মানুষের সাথে আদান-প্রদান করে, ব্যক্তি মানুষ কীভাবে এসব প্রবণতার সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখায়, কীভাবে এসব প্রবণতা টেক্সটের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে— তার ভেতর দিয়ে তিনি সেকুলারিজমকে পাঠ করার চেষ্টা করেছেন। এই পর্যালোচনার কালে তিনি সেকুলারিজম ধারণাটার ভেতরে বিস্তর অসঙ্গতি আবিষ্কার করেন, যা তিনি আমাদের সামনে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তুলে আনেন। তিনি আলোচনা করতে যেয়ে কোনো নিজস্ব মতামত দেন না বা মূল্যবিচার করেন না। তবে তিনি সেকুলার ও সেকুলারিজমকে পৃথকভাবে দেখেছেন। যদিও এটা পরস্পরের মধ্যে মিশে থাকে।

সেকুলারায়ন প্রক্রিয়াটার তথাকথিত নিষ্পাপ চেহারাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি উদারনৈতিক বয়ানে উঠে আসা সেকুলার জ্ঞানতত্ত্ব ও সেকুলারিজম নামক রাজনৈতিক আদর্শের ভেতরকার সম্পর্কটাকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন। তিনি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে সেকুলারিজমকে প্রত্যাখ্যান করেননি, কিন্তু সেকুলার ধারণার তথাকথিত নিরপেক্ষতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, তালাল এমন একটা সেকুলারিজম চান যা সেকুলারবর্জিত? কারণ, পশ্চিমের ইতিহাস থেকে ধর্মতন্ত্রের পরিণতি তিনি দেখেছেন। তিনি সেকুলারিজমের কাঠামোকে ভাঙ্গতে চাননি, কিংবা সেকুলারিজমকে অতিক্রম করতে চাননি। । গোড়ায় তিনি একজন সেকুলার নৃতাত্ত্বিক। এই কারণে তিনি হয়তো সেকুলারিজমের সমর্থক হয়েও এর রাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতির এক ধরনের de-theolization— নিধর্মীকরণ আশা করেন। যেমন— হেগেল ধর্মের de-theolization চেয়েছিলেন। অনুমান করি, তালাল সেকুলারিজমের এই নিধর্মীকরণের ভেতর দিয়ে সেকুলারিজমের এক সাদাসিধা নিরপেক্ষ মূর্তি খাঁড়া করতে চান। এই কারণেই তাকে অনেকে পোস্ট সেকুলার— উত্তর সেকুলারবাদী[৩০], কেউ কেউ Revisionist secular— সংশোধনবাদী সেকুলার[৩১] হিসেবে পাঠ করতে চান।

তাহলে আমরা বাংলাদেশের মানুষ তালালের সেকুলারিজম পাঠকে কীভাবে গ্রহণ করবো? আমরা জানি, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির

একটা শক্তিশালী অংশ সেকুলার এবং ধর্মের ব্যাপারে এরা যথেষ্ট অসহিষ্ণু। এদের একটা শক্তিশালী বয়ান আছে। এই বয়ান দিয়ে তারা বাংলাদেশের যাবতীয় শান্তি, প্রগতি, উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতার বাছ-বিচার করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই বয়ানকে ভিত্তি করে ভাষা ও ধর্মের ভেতরে মারামারি বাঁধিয়ে একটা সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের এই এক চক্ষুবিশিষ্ট সেকুলারবাদীরা একদিকে ইসলামের ভাষাকে বোঝে না, অন্যদিকে সেকুলারিজম নিয়ে এদের মোহ এত বেশি যে, এর কোনো পর্যালোচনামূলক আলোচনাতেও এরা আগ্রহী নয়। আধুনিকতা ও সেকুলারিজম নামের বর্গগুলো অন্যান্য অনেক দেশের মতো আমাদের এখানেও বহুদিন ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষের মুক্তি নিয়ে এসব ধারণা যে সর্বজনীন প্রত্যাশা একদিন তেরি করেছিল, তা আজ ক্ষীণ হয়ে আসছে। কারণ, এসব ধারণার ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে নানা মাত্রা আছে। এই মাত্রা বিভিন্ন স্থানে বৈষম্য নামক বস্তুটিকে জিইয়ে রেখেছে। তালালের লেখার ভাষা পুরোটাই আধুনিক। এই লেখার গুণের কারণে আমাদের এখানকার যেসব প্রগতিবাদীরা সেকুলার মুখোশ পরে আছেন, সেটা খুলে ফেলে তাদের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ছয়.

তালাল আসাদের *Secular Translations* কিতাবটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে। এটা মূলত তিনটি বক্তৃতার সমষ্টি। এ বক্তৃতাগুলো তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে রুথ বেনেডিক্ট লেকচার হিসেবে ২০১৭ সালে প্রদান করেন। *সেকুলার ট্রান্সলেশনস* কিতাবটির উপ-শিরোনাম হচ্ছে *Nation-State, Modern Self, and Calculative Reason*। এর একটা বাংলা রূপান্তর হতে পারে— সেকুলার তরজমাসমূহ : জাতিরাষ্ট্র, আধুনিক সত্তা ও হিসাবের যুক্তি।

এসব বক্তৃতায় তালাল কী বলতে চেয়েছেন? তালাল জীবনভর পশ্চিমা আধুনিকতা ও সেকুলারিজমের সাথে লিপ্ত থেকেছেন এবং এর অসঙ্গতি

ও পরস্পরবিরোধিতাকে উন্মোচন করেছেন। এ কিতাবটি তারই ধারাবাহিকতা। জাতিরাষ্ট্র, আধুনিক সত্তা ও গাণিতিক হিসাব-নিকাশের ভেতর দিয়ে তিনি এই চিত্রটি তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। ফরমেশনসে তালাল যে কথাটা বলে শেষ করতে পারেননি, ট্রান্সলেশনসে এসে তিনি তার শেষ করেছেন। এদিক দিয়ে দেখলে জিনিয়লজিস, ফরমেশনস ও ট্রান্সলেশনস— এই তিনে মিলে একটা বর্ণালী তৈরি করেছে।

তালাল জিনিয়লজিস ও ফরমেশনসে ধর্ম ও সেকুলার— এই বাইনারিকে সমালোচনা করে সেকুলার ধারণার সাথে বোঝাপড়া করেছিলেন। জিনিয়লজিসে তিনি দেখান— ধর্ম নামক বর্গটা সেকুলার ধারণা দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনো বিশ্বজনীন সংজ্ঞা হয় না। ফরমেশনসে এসে দেখান— ধর্ম ও সেকুলারের ভেতরে যেমন পরম্পরা আছে, তেমনি আছে ছেদ। ট্রান্সলেশনসের ক্ষেত্রে তালাল সেকুলার ধারণার সাথে সরাসরি বোঝাপড়া না করে তরজমা ও ভাষার ভেতর দিয়ে মোকাবিলা করেছেন। হেবারমাস দিয়ে শুরু করে রোমান জ্যাকবসন, ওয়ালটার বেনজামিন, লামেন সান্নেহ প্রমুখদের রচনা ব্যবহার করে তিনি তার যুক্তি খাঁড়া করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের ভাষাচিন্তাকে ব্যবহার করে যাবতীয় তল্লাশি চালিয়েছেন। ভিটগেনস্টাইনের *Philosophical Investigations* কিতাবের দুটি ধারণা তালালের আলোচ্য লেখার পিছনে বড়ো ভূমিকা রেখেছে। ভিটগেনস্টাইন দেখান— ভাষার ব্যবহার একটা ভাষার খেলা। ভাষার খেলা বুঝতে পারা একটা জীবনের ধরণকে বুঝতে পারার সমান ঘটনা।[৩২]

একটা ভাষার মধ্যে প্রবেশ মানে একটা জীবনধারার মধ্যে শুধু প্রবেশ নয়, একটা ভাষা যে যাপিত জীবন তৈরি করে, তার ভেতরেও প্রবেশ করা। ভাষার অনিশ্চিত প্রকৃতির কারণে তরজমার কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। সমানুপাতিক প্রতিষ্ঠার জন্য তরজমা প্রয়োজন— এই পুরোনো ধারণাটা ভাষিক অনিশ্চয়তা বাতিল করে দেয়। দুটো ভাষিক ঐতিহ্যকে সমান্তরালভাবে হাজির করা অসম্ভব কাজ। যেহেতু টেক্সটের চর্চা ব্যক্তিকে সামনে কী আছে দেখতে দেয় না, তাই তালাল এখানে সেকুলারিজম বিষয়টাকে পরোক্ষভাবে বোঝাপড়া করেছেন।

এ বই ভাষা ও তরজমা বিষয়ে উদারনৈতিক সেকুলার বোঝাবুঝিকে সমালোচনা করে। উদারনৈতিকরা মনে করে ভাষার ভেতর দিয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো হচ্ছে যোগাযোগের বিশ্বজনীন মাধ্যম। এই ক্ষেত্রে তারা মনে করে তরজমা হচ্ছে একটা জ্ঞানগত-বুদ্ধিগত ব্যাখ্যার বিষয় এবং অনেকটা— a move from one set of signs to another[৩৩]। তালাল এই সেকুলার বোঝাপড়াকে দুটো জায়গা থেকে চ্যালেঞ্জ করেন।

প্রথমে ওয়াল্টার বেনজামিনকে সাক্ষী মেনে তিনি বলেন— তরজমা মূল এবং গৃহীত ভাষা উভয়ের জন্য শক্ত কাজ। দ্বিতীয়ত তিনি দেখান, তরজমাটা বুদ্ধিগত ব্যাপার নয় মোটেই। কারণ :

> The sign is translated into the sensible body through the cultivation of sensibilities.[৩৪]
>
> [সংবেদনশীলতার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতীকচিহ্ন সংবেদনশীল দেহে অনূদিত হয়।]

এ বই প্রাথমিকভাবে তিনটি বক্তৃতার সমষ্টি হলেও পরবর্তীকালে এগুলোকে সম্প্রসারিত করে একটা অ্যাকাডেমিক রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনটি বক্তৃতার সাথে যুক্ত হয়েছে একটি ভূমিকা ও সমাপ্তি মন্তব্য। তিনটি বক্তৃতা তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে হলেও বইটির শিরোনাম আমাদের মনে করিয়ে দেয় তরজমা নামক বিষয়টি প্রত্যেককে যুক্ত করেছে। ভূমিকা ও সমাপ্তি মন্তব্য তিনটি বিষয়ের ভেতরে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে এবং তরজমা বিষয়ে তালালের অবস্থানকে পরিষ্কার করেছে।

তালালের প্রথম বক্তৃতার নাম Secular Equality and Religious Language। এখানে তালাল দুই ধরনের যুক্তিকে মোকাবিলা করেছেন। যারা মনে করে সেকুলারিজম হচ্ছে ধর্ম থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তিনি তাদের সামনে সেকুলারিজমের খ্রিষ্টীয় শিকড় মেলে ধরেন। অন্যদিকে যারা মনে করে উদারনৈতিক সেকুলার সাম্য হচ্ছে পৃথিবীর জন্য খ্রিষ্টধর্মের উপহার, তাদের সামনে তিনি এটার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম অর্ধাংশে তিনি উদারনৈতিক সেকুলার সাম্যের সমালোচনা করেন। বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে

তিনি দেখান, কীভাবে এটা অসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা অসাম্য তৈরি করেছে। এ অংশটুকু হচ্ছে এ প্রবন্ধের সবচেয়ে মূল্যবান আলোচনা। এখানে তালাল দেখান উদারনৈতিকরা সেকুলার জনপরিসরে ধর্মীয় শব্দের সেকুলার রূপান্তরে আগ্রহ দেখায় এবং এটাকে গণতন্ত্রায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে। হেবারমাসের বরাতে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন ধার্মিক নাগরিকের তার ধর্মীয় ভাবমূর্তি ও শর্তকে বাকি জনগণের কাছে গ্রহণশীল করে তোলার প্রয়োজন আছে। এই শর্তের কারণে সেকুলারায়ন প্রক্রিয়া ধর্মের সাধারণ সংজ্ঞাকে পাল্টে দিতে চায়। শুধু তাই নয়, এটা সর্বাত্মকভাবে ভূখণ্ড ও অধিকারের ওপর ভিত্তি করে সার্বভৌমত্বের ধারণা দিয়ে রাজনীতির চরিত্রকেও পাল্টে দিতে চায়। এই সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র নাগরিকের ওপর নজরদারি করে এবং সে কীভাবে কথা বলে, কাজ করে, চিন্তা করে— তার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

তালাল দেখান, একদিকে যেমন উদারনৈতিকতার ভেতরে পরিবর্তনশীল প্রবণতা রয়েছে, তেমনি নানা প্রবণতার বৈচিত্র রয়েছে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে এটা বিভিন্ন চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। যখন উদারনৈতিকরা নিরপেক্ষতার কথা বলে, সেকুলারিজম তখন বহুত্বের ধারণা নিয়ে আসে, যদিও তা সাম্যের সাথে সমন্বয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। যখন এটা সহিষ্ণুতার কথা বলে, তখন এটা 'বিশেষ শ্রেণি ও বর্গের' ভিত্তিতে দুনিয়াজোড়া এক 'সভ্যতার' ধারণা নিয়ে আসে। তালাল দেখান, এটা সতেরো ও আঠারো শতকে বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে আসে (যখন এটা চার্চ ও রাজার ক্ষমতাকে সীমিত করার কথা বলেছিল), উনিশ ও বিশ শতকে এটা সামাজিকভাবে রক্ষণশীল প্রবণতায় পরিণত হয় (যখন এটা উঁচু শ্রেণির ও সাম্রাজ্যিক সুবিধাকে সংহত করতে চেয়েছে) এবং বর্তমানে এটা লুণ্ঠনজীবীতে (predatory) পরিণত হয়েছে। এখন এটা শুধু বাজারের স্বাধীনতার কথাই বলে না, এটা লগ্নিপুঁজির (Finance capital) বিশ্বায়ন ও অসমতা তৈরিতেও বিপুলভাবে উৎসাহ দেয়। তাই উদারনৈতিকতা শেষ পর্যন্ত কোনো সমজাতীয়, স্থিতিশীল বা অভিন্ন ধারণা নয়। আঠারো-উনিশ শতকের উদারনৈতিকদের সাথে বিশ ও একুশ শতকের উদারনৈতিকদের ভেতরে রয়েছে বিপুল তফাৎ। 'প্রকৃত উদারনৈতিকতা' বলে কিছু আছে কিনা সেটা এখন একটা প্রশ্ন। যদিও

প্রতিদিনের জীবনে মানুষ উদারনৈতিক ও অ-উদারনৈতিক কথাটা নিরন্তর বলতেই থাকে। তালাল তাই বলতে পারেন :

> Like all great historical ideologies, liberal language contains the possibility of insight and self deception, compassion and ruthlessness.[৩৫]
>
> [অন্যান্য সকল মহান ঐতিহাসিক মতাদর্শের মতো উদারনৈতিক ভাষা অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মপ্রতারণা, সহানুভূতি ও নির্মমতার সম্ভাবনা ধারণ করে।]

উদারনৈতিক মূল্যবোধের একটা শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে বাক্-স্বাধীনতা। কিন্তু তালাল দেখান, এই অধিকারের কথা বলার পরে সেকুলারবাদীরা কখনো কখনো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করেন। উদারনৈতিকতার শর্ত হিসেবে জনপরিসরে (ক্লাব, থিয়েটার, সংসদ, সভাকক্ষ) নাগরিককে মুক্ত মেলামেশার (free association) কথা বলা হয়। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, এসব পরিসরে মেলামেশা ও কথা বলায় রাষ্ট্র একটা সীমানা টেনে দেয়— নাগরিক কি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে পারে অথবা তার কোনো গোপনীয়তাকে উন্মোচিত করতে পারে? তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয় সেই নাগরিককে শাস্তি দেওয়া। তালাল প্রশ্ন করেন, নাগরিকতার ধারণা কি তাহলে স্বাধীন ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কিনা নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনস্ত করে?

সব আদর্শের মতোই উদারনৈতিক সেকুলারিজম নানা ইতিহাস ও জীবনধারার ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। যারা উদারনৈতিকতাকে বুঝতে চায়, তাদের প্রশ্ন করা উচিত— এটা কী ধরনের স্বাধীনতা ও সমতার কথা বলে, কারা এর বিরোধিতা করে এবং কীভাবে, কারা এটাকে মান্যতা দেয়? এই সামাজিক তৎপরতার ভেতর দিয়ে 'লিবারেলিজম', 'সেকুলারিটি', 'রিলিজিয়ন' শব্দগুলো ব্যবহৃত ও প্রতিব্যবহৃত হয়। ভাষা যেহেতু ব্যবহারের সাথে জড়িত, এই ব্যবহার তাই একটি জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে এবং এই জীবন পাল্টে গেলেই তা অন্যরকম হয়ে যায়। জীবনের এই তরজমা প্রতিনিয়ত ঘটে। সেকুলারায়নকে তাই ধর্মের ব্যাকরণ ও কাছাকাছি শব্দের ভেতরকার এক ধরনের মৌলিক রূপান্তর বলা যেতে পারে।

উদারনৈতিক রাষ্ট্রে এক ধরনের আইনি সমতার কথা বলা হয়। নাগরিক নির্বিশেষে সবাই আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হবে এবং নাগরিককে একইভাবে আইনকে মান্য করতে হবে। এখানে ধর্ম বা নৃতাত্ত্বিক পটভূমি বিচার্য বিষয় নয়। তালালের প্রশ্ন হলো— এই আইনি সমতা কি একই সাথে সুযোগের সমতা কিনা? উদারনৈতিক রাষ্ট্রে চাকরির ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়। তালালের মতে এ অধিকার প্রতিযোগীর ভেতরে এক ধরনের careerist— উন্নতি প্রবণতার মানসিকতা তৈরি করে, যা গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থি, যদিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নয়। কখনো কখনো দেখা যায় প্রার্থীর বিশেষজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, অনুন্নত শ্রেণির জন্য কোটা প্রভৃতিকেও আইনি কাঠামোর ভেতরে আনা হয়। সেক্ষেত্রে আইনি সমতার ধারণাটা বৈশ্বিক মানদণ্ড হতে পারে না। উল্টো আইনি সমতার ধারণা নিজেই অবিচারের কারণ হতে পারে, যার বিরুদ্ধে আমরা সমালোচনাও দেখি।

আমরা আইন, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিভিত্তিক অসমতার কথা জানি। উদারনৈতিক রাষ্ট্র এর বিলোপের কথাও বলে। কিন্তু এই রাষ্ট্রে যে অসম সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হয়, তার বিরুদ্ধে কেউ একটা সমালোচনা করে না। বরং, এই অসমতাকে দূর না করে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা হয়। উদারনৈতিক রাষ্ট্রে উঁচু সামাজিক মর্যাদার একটা ধারণা আছে। যেমন— নাজিরা করেছিল। বিলাতের লর্ডের মর্যাদা ও সাধারণ মানুষের মর্যাদা কি এক? এসব ধারণা উদারনৈতিকতার সাথে খাটে, ফ্যাসিবাদের সাথে খাটে, আবার একই সাথে কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যবস্থার সাথেও চলে। এটা দেখা গেছে, আধুনিকায়ন ও সেকুলারায়নের সাথে সাথে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা যেমন উদারনৈতিক মূল্যবোধের সক্ষমতাদানকারী হিসেবে কাজ করেছে, তেমনি উদারনৈতিক ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে উদারনৈতিকরা তাদের প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা, রাজনৈতিক দুর্নীতি, জগতব্যাপী এক বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা এবং শত্রুজ্ঞানে নিজের নিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রবল তাড়নার ব্যাপারে কোনো কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি। একসময় তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে আধুনিকায়ন, উদারনৈতিকতা ও সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরতান্ত্রিকতা ও

সন্ত্রাসকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে সন্ত্রাসকেও ব্যবহার করা হয়েছে বা এখনও হয়।

তালাল দেখান, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিলাতের মতো একটা সমজাতীয় উদারনৈতিক গণতন্ত্র, এক বিরাট অসমজাতীয় মানুষকে শাসন করেছে। এই মৌলিক তফাৎ সেকুলারায়ন প্রক্রিয়াকে মেট্রোপলিসে ও কলোনিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করেছে। বিলাতে তাই শিল্প ও সাম্রাজ্যের অসমতা উদ্ভূত শক্তি সাম্যের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করেছিল, যার ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিণতি আমরা দেখি— মেট্রোপলিসে উদীয়মান কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের উপস্থিতি ও সমাবেশ, বন্দর ও খনি শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও হরতাল পালনের সক্ষমতা এমন একটা রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছিল, যা সামাজিক সুবিচার ও মালিকদের কাছে সুবিবেচনা প্রতিষ্ঠার ডাককে সহজ করে দেয়। অন্যদিকে কলোনিগুলো গ্রাম থেকে মেট্রোপলিসে কাঁচামাল সরবরাহ করার এবং বন্দী বাজার (captive markets) হিসেবে ব্যবহৃত হয়— যতক্ষণ না তাদের উঁচু শ্রেণির নেতৃবৃন্দ তাদেরকে সংগঠিত করে আজাদির ডাক দেয় এই আশায় যে, তারা পূর্বতন শাসকদের সাথে একপাতে বসতে পারবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো স্বাধীনতা পাওয়ার পর নতুন সেকুলার শাসকরা সেই পুরোনো রীতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের জনগণকে নিপীড়ন শুরু করে।

ইউরোপের মানুষরা এখন তাদের ঐতিহ্যকে 'জুডিও ক্রিশ্চান' বলে থাকেন। তাদের সমতার ধারণা এই রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে, যাকে তারা মুসলমানদের জন্য প্রসারিত করতে রাজি নন। কেন? কারণ, তারা তাদেরকে একটি অ-উদারনৈতিক ধর্মের অনুসারী মনে করেন। তালালের কথা হলো— সেকুলারিজমের দাবি মতো ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের প্রতি নিরপেক্ষতার কথা একটা বড়ো রকমের সমস্যাজনক বিষয়। তাই রাজনৈতিক উদারনৈতিকতা অ-পশ্চিমা, বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য সমান পরিসর নিশ্চিত করে না। কারণ, এটা এমন একটা সীমানা, যারা পশ্চিমা আধুনিকতার ভাষা বোঝে না, তাদেরকে পৃথক করে। ভাষা তাই কোনো নিরপেক্ষ বিষয় নয়। বরং, যেভাবে আমরা পৃথিবীতে বসবাস করি, তারই প্রতিধ্বনি করে।

এরপরে তালাল এ অধ্যায়ে য়ুরগেন হেবারমাসের 'পোস্ট সেকুলারিজম' তত্ত্ব নিয়ে আলাপ তোলেন। হেবারমাস সাম্যের সমস্যা মোকাবিলার জন্য ধর্মীয় লোকজনকে উদারনৈতিক পরিসরে জায়গা দেওয়ার কথা বলেন, যদি তাদের ধর্মীয় বয়ানকে সেকুলার বয়ানে রূপান্তর করা যায়, যা সকলের, এমনকি নাস্তিকের জন্যও গ্রহণযোগ্য হবে।[৩৬]

তালালের কথা হলো, হেবারমাসের এই সেকুলার তরজমার ধারণা আসলে উদারনৈতিক রাজনীতি সম্প্রসারণের বাহানা মাত্র। কারণ, হেবারমাসের জনপরিসর বিষয়ক আলাপে প্রাক-উদারনৈতিক ও অ-উদারনৈতিক ধর্মের কোনো জায়গা নেই।[৩৭] কারণ, তার মতে ধ্বংসাত্মক নয় এমন সেকুলারায়ন পশ্চিমেই কেবল সম্ভব। আমরা জানি, সেকুলারায়ন ও আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের কালে একটি ধর্মকে (খ্রিষ্টান ধর্ম) শুধু তরজমা করা হয়নি, ধর্ম হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ইসলামকে তরজমা করা যায় না। হেবারমাস মনে করেন এটা আধুনিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। হেবারমাসের চিন্তাকাঠামো পশ্চিমা উদারনৈতিক সেকুলার ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই চিন্তাকাঠামো অগ্রিম মনে করে ব্যক্তির 'যুক্তি', 'স্বশাসন', 'স্বচ্ছতা' প্রভৃতি ঐতিহ্যশাসিত, সাম্প্রদায়িক, তরজমাহীন, অস্বচ্ছ ইসলামি সত্তার বিপরীতে সংজ্ঞায়িত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শেষাংশে তালাল ২০০০ সালে ঘটা ফ্রান্সের হিজাব বিতর্কের দিকে নজর দেন। তিনি দেখান, যারা হিজাব পরিধানকে অধিকার ও যারা জনপরিসরে এর পরিধানকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে বলছে, তারা উভয়েই হিজাবকে একটা চিহ্ন হিসেবে শনাক্ত করেছে। হিজাবের পক্ষে যারা, তাদের জন্য এটা পরিচয়ের ও নিষিদ্ধের পক্ষে যারা, তাদের জন্য অত্যাচারের চিহ্ন।[৩৮] এভাবে জনপরিসরের জন্য হিজাবের 'প্রকৃত মর্ম' উদ্ধার, ব্যাখ্যা ও তরজমার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা কেউ মনে করেনি— মুসলিম নারীদের কাছে এটা জীবনযাপনের অংশ। উল্টো এটা হয়ে উঠল একদিকে পরিচয় প্রকাশের, অন্যদিকে অত্যাচারের চিহ্ন। হিজাবের অর্থের এই তরজমা একটা বড়ো রকমের তফাৎ সৃষ্টি করল— যেভাবে একজন জনপরিসরে আমল করে এবং এই আমলের পিছনের নিয়ত, যা কেউ দেখতে পায়

না, যার কারণে চিহ্নকে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। উভয়ক্ষেত্রে হিজাব পরিধানকে অসাম্যের চিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়। বিশেষ করে উদারনৈতিক সেকুলার বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে এই আলোচনা এজেন্সির প্রশ্ন নিয়ে আসে। এই বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে কর্তাই সক্রিয় ব্যক্তি, যে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে। সাম্যের এটাই হচ্ছে পূর্বশর্ত। এর প্রতিক্রিয়ায় তালাল প্রাচীন খ্রিষ্টান মঠে সন্ন্যাসীদের 'স্বেচ্ছা আনুগত্যের' উদাহরণ নিয়ে আসেন, যেখানে ধার্মিকতা অর্জনের জন্য স্বয়ংক্রিয় কর্তার ধারণাকে বাতিল করতে হয়।

তালালের দ্বিতীয় বক্তৃতার নাম Translation and the Sensible Body। তালাল এখানে দেখান ইসলামি ঐতিহ্য ও জুডিও-ক্রিশ্চিয়াননির্ভর পশ্চিমা আধুনিকতার ভেতরকার পারস্পরিক রূপান্তর ও তরজমা একটা জটিল ও সমস্যায়িত ব্যাপার। যেমন— প্রথমেই তিনি আলাপ তোলেন কুরআনের তরজমা সম্ভব কিনা। যদিও বহু ভাষায় কুরআনের আক্ষরিক তরজমা হয়েছে। প্রথমত, এটা আল্লাহর বাণী। এর সাথে ঈমানদারদের এক ধরনের শ্রদ্ধা ও ভয় জড়িয়ে থাকে। এমনকি কুরআন স্পর্শ করতে হলে এক ধরনের শুদ্ধতার প্রয়োজন হয় এবং এর শব্দ ও বাণীকে চূড়ান্ত হিসেবে মান্য করতে হয়। নামাজ হচ্ছে একটা বিধিবদ্ধ ইবাদতের পদ্ধতি। এ সময়ে তিলাওয়াতকারীর শরীরে-মননে-চিন্তনে যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়, তা একান্তই সুনির্দিষ্ট ও তিলাওয়াতকারীর অন্তর্গত সত্তার সাথে জড়িত। এই বিশেষ অনুভূতিকে কি তরজমা করা যায়?

আরবি ভাষা পবিত্র বলে তরজমা করা যায় না— তা নয়। কিন্তু সীমাতিক্রান্ত তুরীয় শক্তির সামনে কুরআন তিলাওয়াত যে স্বর্গীয় মূল্য ও সত্য প্রকাশ করে, তা অনুবাদ করা কি সহজ? এজন্যই বলতে হয়, কুরআনের টেক্সট নয়, ইবাদতের অ্যাক্ট বা কর্মটাই অনুবাদ-অযোগ্য। যার প্রকৃত মর্ম অভিধানে নেই।

এ পর্যায়ে তালাল বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালির বরাত দিয়ে বলেন, আধুনিকতা ঐতিহ্যবাহী মুসলিম অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তিনি দেখান, অ্যারিস্টটল self বা আত্মা সম্বন্ধে বলেছেন, এটার মূল নির্যাস হচ্ছে চিন্তা এবং চিন্তাশীলতার জীবন

কাটানোই হচ্ছে জীবনের সার। অন্যদিকে গাজ্জালির কথা হলো, আত্মার খোদামুখী হওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য।

এ কারণেই গাজ্জালি জীবনের সব কিছুকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু একত্র করে জীবনের পূর্ণাঙ্গতা হিসেবে দেখেছেন। এই ঐতিহ্যে 'ধর্ম' ও 'অধর্মের' ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি নেই। তালাল দেখান, সেকুলারিজম 'ধর্মকে' একটা স্বয়ংক্রিয় এলাকা ও 'ধর্মীয় বয়ানকে' একটা টেকনিক্যাল ভাষা হিসেবে দেখতে চায়। যেমন প্রতিদিনের নামাজ একটি পবিত্র ঘটনা। এর সাথে জাকাতকে যুক্ত করে দেখা হয় দাতব্য কাজ হিসেবে। কিন্তু সেটি সেরকম ব্যাপার নয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অনুমতিপ্রাপ্ত (ওয়াজিব) ও নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয়। এ দুটো ইতি ও নেতি মিলিয়ে 'ধর্মীয়' জীবন তৈরি হয় না। এর বাইরে মাকরুহ ও মুস্তাহাবের ব্যাপার আছে। সুতরাং শরিয়াহকে পশ্চিমা অর্থে আইন হিসেবে তরজমা করা যাবে না। কারণ, এখানে বিচারযোগ্যতা ও বিচার অযোগ্যতার ব্যাপার আছে।

উপরের আলোচনার সূত্রে তালাল দেখান, ধর্মীয় ভাষা ও ধারণা বুঝতে হলে এটাকে তার বৃহত্তর রীতি, পদ্ধতি, চর্চা ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে বুঝতে হবে। ধর্মীয় ভাষাটা একদিক দিয়ে ধর্মের রীতি ও প্রথার ফসল, যা আমাদের সমস্ত ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে জড়িয়ে থাকে। তাই ধর্মীয় ভাষাকে ধর্মের চর্চা ও রীতির ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ না করে বিমূর্তভাবে দেখা কাজের কাজ হবে না। কুরআনের ব্যাখ্যা পদ্ধতি ও মুসলমানের নামাজ পশ্চিমা কোনো পদ্ধতির সাথে তুলনীয় নয় এবং পুরোপুরি পৃথক একটা জিনিস। এ কারণেই এটা পৃথক যুক্তি, মূল্যবোধ ও রাজনীতির চর্চা ও উৎপাদন করে। যখন কেউ এই পার্থক্যকে বিবেচনায় না নিয়ে মুসলমানের নিয়ত, ইরাদা, ধ্যান-ধারণাকে আধুনিক চশমা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যায়, তখন সেটা ভুল বার্তা দেয়। এ কারণেই ম্যানহাটানের উজবেক অভিবাসী ট্রাক ড্রাইভার সাইফুল্ল সায়পভকে মানুষের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্মীয় সন্ত্রাসী এবং লাসভেগাসের শুটার স্টিফেন পেডডককে মানসিক ভারসাম্যহীন হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে তালাল বলতে চান, এই ভুলটা সেকুলার তরজমায় আধুনিক বয়ানের সীমাবদ্ধতার কারণে তৈরি হয়।

তালালের শেষ বক্তৃতার নাম Masks, Security and the Language of Numbers। তালাল এখানে দেখান জাতিরাষ্ট্রের একটা অন্তর্নিহিত সন্দেহ বাতিকতা থাকে। এটাকে জাতিরাষ্ট্র 'সংখ্যার ভাষা দিয়ে' বোঝাপড়া করে। এই সংখ্যার ভাষা দিয়ে জাতিরাষ্ট্র তার নাগরিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তালাল এই নিবন্ধটির শিরোনামে ব্যবহৃত mask— মুখোশ শব্দটির কুলজি অনুসন্ধান করেছেন এবং দেখিয়েছেন— এর সাথে ব্যক্তিসত্তার ধারণা জড়িত। মার্কেল মসের (Marcel Mauss) বরাতে তালাল দেখান, ল্যাটিন মাসক শব্দের অর্থ ব্যক্তি। সেদিক দিয়ে মুখোশ মানুষের ভেতরকার দ্বৈততাকে বাড়িয়ে দেয়— যেমন শরীর ও মন, স্বতন্ত্র ও সম্বন্ধযুক্ত, ব্যক্তি ও জন— যার তরজমা রীতিমতো সমস্যাযুক্ত হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন নৃবিজ্ঞানীদের কাছে আচার ও সংস্কৃতির পার্থক্য করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

এই দ্বৈততার জন্ম প্রাক-আধুনিক ইউরোপীয় রেনেসাঁর কালে। এই দ্বৈততার ফলে সন্দেহ বাতিকতার জন্ম, যার ওপরে ভিত্তি করে জাতিরাষ্ট্র তার কায়কারবার করে, জনগণের ওপর নজরদারি করে, বিদ্রোহ মোকাবিলার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে জনগণের নিরাপত্তার কথা বলে পুলিশী তল্লাশী বাড়িয়ে দেয়। এই প্রেক্ষিতেই 'সংখ্যার ভাষা' তার বিমূর্তায়ন ও সাধারণীকরণের গুনে জাতিরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

তালাল দেখান, জাতিরাষ্ট্র ও পুঁজিতান্ত্রিক করপোরেশনগুলো সংখ্যার ভাষা ব্যবহার করে পুরোনো মুনাফা অ-বান্ধব সমাজকে আজকের মুনাফাবান্ধব সমাজে পরিণত করেছে। তিনি দেখান, গাণিতিক হিসাব-নিকাশকে সমাজ বাস্তবতা ধরে ভবিষ্যতের সমস্যা ও বাঁধাকে অপসারণ করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উন্নতি ও প্রগতির পশ্চাতের এই হিসাব-নিকাশ আবহাওয়ার পরিবর্তন, পরিবেশের বিপর্যয়, এমনকি আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূর করতে পারছে না।

সমাপ্তি মন্তব্যে তালাল দেখান, সেকুলার যৌক্তিকতায় সমস্যা সমাধানে মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনার আশাবাদ থাকলেও, সেখানে মানুষের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কোনো আলাপ নেই। সেকুলার যৌক্তিকতা বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার সূচনা করলেও, এটা একটা ভয়ানক

রকম অনিশ্চয়তাও তৈরি করেছে। গাণিতিক হিসাব-নিকাশ অনিশ্চয়তা কিছুটা হ্রাস করেছে বটে, তবে বিপর্যয় কখন আসবে, তার সম্ভাবনাকে তিরোহিত করতে পারেনি। এ কারণেই সেকুলার যুক্তি ও ভাষার বাইরে মানুষের ভেতরে নতুন কোনো ভাষার উত্থানের প্রত্যাশা বাড়ছে। তালাল আল-গাজ্জালি থেকে ওয়াল্টার বেনজামিন— এই বিচিত্র ধরনের চিন্তানায়কদের ভাষাগুলোকে পরীক্ষা করেছেন। হয়তো এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি কোনো বিকল্প ভাষার কথা ভেবে থাকবেন, যা আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগকে সহজতর করবে।

এ বই তালালের মননশীলতার স্মারক। বিচিত্র বিষয়কে জড়ো করে তিনি সেকুলারিজমের খুতকে উন্মোচন করেছেন, যা সৃজনশীল পাঠকদের অনেক কাজে লাগবে।

সাত.

২০০৬ সালে তালাল আসাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরভিনে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েলেক লাইব্রেরি লেকচার দেন। এখানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলোর সমষ্টি পরে *On Suicide Bombing* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তালাল এখানে তার স্বভাবসুলভ জিনিয়লজিক্যাল পদ্ধতিতে আলাপ করেন এবং পশ্চিমা উদারনৈতিকতার ভেতরে যে কত রকম স্ববিরোধিতা— তা খুলে খুলে দেখান।

তালাল এই বক্তৃতাগুলো দেন ১/১১-এর ঘটনাগুলোকে উপলক্ষ করে। এই ঘটনার পর পশ্চিমা দুনিয়া ব্যক্তি আকারে নয়, পুরো মুসলিম সমাজকে দোষারোপ করা শুরু করল। তারা বলতে লাগল, সন্ত্রাসের প্রবণতা মুসলিম সভ্যতার ভেতরে পাওয়া যায়। সেই সূত্রেই সভ্যতার দ্বন্দ্ব কথাটা আরো ফলাও করে প্রচারিত হলো। সুতরাং, সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচতে হলে পুরো ইসলাম ধর্মটাকে সংস্কার করে ফেলতে হবে। সেই সংস্কার অভিযানের দায়িত্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের।

তালালের প্রথম বক্তৃতার নাম Terrorism। এখানে তিনি দেখান, সভ্যতার দ্বন্দ্ব কথাটাই সমস্যাজনক। সভ্যতায় সভ্যতায় বিস্তর দেয়া-নেয়া

ও লিপ্ততার নজির আছে। পরস্পরের প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ সভ্যতা বলে কিছু নেই। সভ্যতার নিজের ভেতরেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। মুসলমান কি মুসলমান মারে না? খ্রিষ্টান কি খ্রিষ্টানকে মারে না? সভ্যতার দ্বন্দ্ব কথাটা তৈরি হয়েছে সভ্যতাকে খুবই নির্বাচিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করার কারণে। ১/১১-এর ঘটনার পর পশ্চিমারা যুদ্ধ শুরু করেছে এই যুক্তিতে যে, সন্ত্রাসবাদীরা তাদের হীন রাজনৈতিক লক্ষ্যে নিরীহ মানুষকে খুন করে। সন্ত্রাসীরা অপরাধী— এটা সত্য। কিন্তু তালাল দেখান, পাশ্চাত্য বাহিনীও তো একই অপরাধের সাথে যুক্ত। তাহলে তাদের যুক্তির ভিত্তি কী?

পাশ্চাত্যের যুক্তি হলো, তারা বৃহত্তর ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছে। তাই এই আনুষ্ঠানিক ক্ষতি সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। তাহলে তারা স্বীকার করছে, শুধু সন্ত্রাসবাদীরা নয়, তারাও নিরপরাধ মানুষকে খুন করে। তালালের কথা হলো, নির্বিচারে হত্যা করে বলে সন্ত্রাসীরা খারাপ— এ কথাটা এখন যুক্তির ধোপে টেকে না।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বলছেন সন্ত্রাসীরা অপকর্ম করার পর বিবেকের দংশন অনুভব করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য অনন্যোপায় হয়ে নির্বিচারে হত্যা করে। তারা মানে এটা অপকর্ম। কিন্তু তাদের হাত-পা বাঁধা। তালাল প্রশ্ন করেন, অনন্যোপায় বোঝার উপায় কী? উপায়ের শেষটাই বা কী? সন্ত্রাসবাদীরাও বলে তারা অনন্যোপায় হয়ে এটা করে। তাদের এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তে— নিরুপায় হলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের পরমাণু বোমা ব্যবহার করার অধিকার আছে। তালাল তখন বলেন, এটা তো মানবজাতির আত্মহত্যার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া।

তালাল দেখান, আত্মঘাতী বোমা কেবল মুসলমানরাই ফাটায় না। এ কাজটা শুরু হয়েছে চিন্তায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, ধর্মে হিন্দু তামিল টাইগার্সদের হাতে। কিন্তু ফিলিস্তিনের বোমা পশ্চিমে যে শিহরণ তোলে, শ্রীলঙ্কার বোমায় সেই আলোড়ন ওঠে না কেন?

ম্যাক্স বেভারের বরাতে তালাল বলেন, ইউরোপের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র তৈরি হয়েছে সন্ত্রাস ও পররাজ্য নিপীড়নের ভেতর দিয়ে। অন্যদিকে আলে বাঁদিউর বরাতে তিনি বলেন, যুদ্ধই তো যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বশক্তির সামর্থ্য দিয়েছে। তালাল দেখান, কেন মুসলমানদের সন্ত্রাস গুরুত্বপূর্ণ ও

বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হয়ে ওঠে, আর উদারনৈতিক সন্ত্রাস আলোচনার টেবিল থেকে হারিয়ে যায়। তার জবানিতেই শোনা যাক :

> One suggestion has been that the previous violent groups in Europe were all operating within the framework of the nation-state and were therefore insiders; the present adversaries (Muslim terrorists) are outsiders—even when they are citizens of the liberal democratic state or inhabitants of its governed territories. On the other hand, however reprehensible it was to liberals, the violence of Marxists and nationalists was understantable in terms of progressive, secular history. The violence of Islamic groups, on the other hand, is incomprehensible to many precisely because it is not embedded in a historical narrative—history in the 'proper' sense. As the violence of what is often referred to as a totalitarian religious tradition hostile to democratic politics, it is seen to be irrational as well as being an international threat.[৩৯]

[একটি ধারণা হলো, ইউরোপের পূর্ববর্তী সহিংস গোষ্ঠীগুলো সবাই জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে কাজ করছিল, তাই তারা ভেতরের লোক ছিল; কিন্তু বর্তমান প্রতিপক্ষরা (মুসলিম সন্ত্রাসী) বহিরাগত— এমনকি যখন তারা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক বা এর শাসিত অঞ্চলের বাসিন্দা। অন্যদিকে, উদারপন্থিদের কাছে যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের সহিংসতা প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসের নিরিখে বোধগম্য ছিল। পক্ষান্তরে, ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর সহিংসতা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়, কারণ এটা একটি ঐতিহাসিক বয়ানে— 'সঠিক' অর্থে ইতিহাসে— জড়িত নয়। প্রায়শই গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি

শত্রুতাপরায়ণ একটি সর্বগ্রাসী ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসেবে উল্লেখিত এই সহিংসতাকে অযৌক্তিক এবং আন্তর্জাতিক হুমকি হিসেবে দেখা হয়।]

তালালের দ্বিতীয় বক্তৃতার শিরোনাম Suicide Terrorism। এখানে তিনি আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদের ওপর পশ্চিমা লেখকদের লেখাজোখা আলোচনা করে দেখান, তারা যেভাবে এই সন্ত্রাসের কার্যকারণ ও মতলব খোঁজার চেষ্টা করেছেন, তা একটা সাধারণীকরণ ছাড়া কিছু নয়। এসব লেখকেরা সন্ত্রাসের পিছনের মতলবকে অনেকটা ফিকশনের মতো বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে সেটা ব্যাখ্যা করা অনেক জটিল। যেসব লেখকরা সন্ত্রাসবাদের পিছনে রাজনীতিকে যুক্ত করেছেন, সেই ধারণাকেও তালাল গ্রহণ করেননি। উল্টো তিনি চিন্তার ইতিহাস ঘেঁটে বলার চেষ্টা করেছেন, উদারনৈতিকতা সন্ত্রাসের ধারণাকে রাজনীতির ধারণা থেকে পৃথক করে দেখে বটে, কিন্তু বাস্তবে সন্ত্রাস উদারনৈতিক রাজনীতি নির্মাণের একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যেভাবে সন্ত্রাসকে বৈধ অধিকার হিসেবে দেখে, আজকাল যাদের আত্মঘাতী সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে, তারা সেভাবে দেখে না। উদারনৈতিক রাষ্ট্রগুলো নিষ্ঠুরতা ও সহানুভূতির এক অদ্ভূত সংকর তৈরি করেছে, যা তারা শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

তালালের কথা হলো, একজন নিরীহ নাগরিককে শত্রু গণ্য করে হত্যা করার জন্য একজন কেন নিজেকে শেষ করে দেয়? এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। এই ভয়ংকর জিনিসটা সে কেন ঘটায়? ভয়ংকর এই জন্য নয় যে, সে একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে অথবা নিজে মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়েছে কিংবা নিজেকে হত্যা করেছে, বরং এই কারণে যে, অন্যকে হত্যা করার জন্য নিজেকে হত্যা করেছে। এর কারণ খুঁজে পাওয়া আদতেই জটিল। যেমন— কখন ও কীভাবে আত্মহত্যার মতো ব্রত বা প্রেরণা তৈরি হয়? এখানে কোন ইচ্ছাটা প্রধান— নিজেকে শেষ করা, না অন্যকে শেষ করা? আত্মহত্যাকারী বিস্ফোরক দিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার আগে ঠিক কী কথাটা ভেবেছিল— আমি এই বেজন্মাদের শেষ করতে চাই, কারণ এরা আমার ভাইকে শেষ করেছে; আল্লাহ আমাকে তার জন্য জীবন দেওয়ার কারণে পুরস্কৃত করবেন অথবা এই সরল কারণে এই নিষ্ঠুর দখলদারীর ভেতরে জীবন বাঁচানো অসম্ভব অথবা এটা

কি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু ছিল? তার অজ্ঞান ভাষার পিছনে কি অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল? সে কি প্রফুল্লতার ভেতরে ছিল? অথবা তার কি কোনো দ্বিতীয় চিন্তা, সন্দেহ, অনুশোচনা ছিল, যখন সে এ কাজটা করতে অগ্রসর হয়েছিল? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে কীভাবে ও কতদূর সে সেটা অতিক্রম করতে পেরেছিল? হত্যাকারী যখন নেই, তখন কীভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে? তালাল বলেন, এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না, হয়তো এটা ঠিক না। কিন্তু যত সহজ মনে হয়, তার চেয়ে এটা বেশ জটিল। শুধু মারার জন্য মরেছে অথবা মরার জন্য মেরেছে— এ দুয়ের ভেতরে কি কোনো তফাৎ আছে? তালাল ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী জা বেশলের (Jean Baechler) বরাতে বুফে (Buffet) নামের এক হত্যাকারী সম্বন্ধে বলেন, কেউ কেউ মরার জন্য অন্য লোককে হত্যা করে। বুফে তার শেষ ইচ্ছা হিসেবে ফরাসি প্রেসিডেন্টের কাছে একটা আর্জি করেন। তিনি দাবি করেন, তাকে যেন গিলোটিনের নিচে মরার সুযোগ দেওয়া হয়। তার কথা ছিল, আমি আত্মহত্যার সুযোগের জন্য পরহত্যা করি। এটাই আমার নৈতিকতা। জা বেশলে আবার ভিন্ন দৃষ্টান্তও দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের কামিকাজি বা আত্মঘাতী বৈমানিকরা কিন্তু মারার জন্য নিজেরা মরেছে। জাতীয় ইজ্জতের দিকে চেয়ে তারা এটা করেছে। এদের কাছে জাতির ইজ্জত নশ্বর জীবনের চেয়ে অবিনশ্বর। একজন জাতির ইজ্জতের জন্য মরছে, আরেকজন জাত ক্রিমিনাল বিনা কারণেই মানুষ হত্য করেছে। দুটি ঘটনার নিয়তি কিন্তু মৃত্যু— নিজেকে শেষ করা এদের অবলম্বন মাত্র।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, অন্যকে শেষ করার তো ভিন্ন পথও আছে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা এর কারণ হিসেবে ধর্মের কথা বলেন। তালাল এদের সাথে একমত হননি। তিনি জন ইলস্টার (Jon Elster) নামে একজন সমাজবিজ্ঞানীর বরাত দিয়েছেন। ইলস্টার আবার আরেকজন বিশেষজ্ঞ আরিয়েল মেরারির (Ariel Merari) বরাতে বলছেন আত্মঘাতী বোমারুরা বোমা ফাটানোর আগে খুব উল্লসিত থাকে। তালালের কথা হলো, বোমারুর মনে কী আছে সেটা জানার উপায় কী? বিশেষজ্ঞরা বলেন, হয় এদের মাথা খারাপ হয়েছে অথবা সমাজ ও সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি। এই বিশেষজ্ঞরা আবার এক মুখে দুই কথাও বলেন— বোমারুরা ঠাণ্ডা মাথায় বোমা ফাটায় এবং এদের নিজেদের

ওপর ষোল আনা নিয়ন্ত্রণ থাকে। তালাল এদের ব্যাখ্যায় অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি বলেন— এটা মতলব নয়, অবস্থান। আত্মঘাতী বোমারুর জন্ম পাগলামিতে নয়, আত্মহত্যা প্রবণতায় নয়, পরহত্যা লিপ্সায় নয়, এমনকি ইসলাম ধর্মের ভেতরে এর কারণ খুঁজে লাভ নেই। আত্মঘাতী বোমা অসহায়ের শেষ সম্বল। ভাষাহীনের শেষ ভাষা। বিখ্যাত ধর্মবিদ আইভান স্ট্রেনস্কি (Ivan Strenski) বলেন আত্মঘাতী বোমা ফাটানো কোনো ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটাকে সামাজিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। স্ট্রেনস্কি বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরখেইম (Emil Durkheim) ও তার শিষ্য হাবোয়াকসের (Halbwachs) বরাতে বলেন, আত্মহত্যা ও আত্মোৎসর্গ দুই জিনিস। সমাজ এই দুই জিনিসকে দুইভাবে দেখে। আত্মহতার সাথে সমাজের অনুমোদনে আচারঅনুষ্ঠান যোগ করলে সেটা আত্মোৎসর্গ হয় এবং পবিত্র হয়ে ওঠে। স্ট্রেনস্কি দেখান, ফিলিস্তিনের আত্মঘাতী বোমারুরা ফিলিস্তিনের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। এটা একটা যুদ্ধের কৌশল— স্ট্রেনস্কি সেটা স্বীকার করলেও তিনি মনে করেন, ধর্মটাকে বাদ দিয়ে এটাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, ধর্ম মানেই আত্মোৎসর্গ।

তালাল এখানে স্ট্রেনস্কির যুক্তি গ্রহণ করেননি এবং দুরখেইমকে তার স্বপক্ষে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাও ঠিক মনে করেননি। দুরখেইমের মতে আত্মহত্যা হলো একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, যদিও সমাজ এখানে নানাভাবে জড়িয়ে থাকে। দুরখেইম এরকম ঘটনাকে বলেছেন altruistic suicide— পরার্থপরতার আত্মঘাত। কিন্তু স্ট্রেনস্কি এর সাথে ব্যক্তির ধর্ম বা আচার যোগ করে আত্মঘাতী বোমাবাজির দায় শনাক্ত করলেন। সুতরাং এটাকে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ বলা যায়। এখন ইসরাইলের বিপদের উৎস কী বোঝা গেল। আর এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইসরাইলের সব কিছু করার অধিকার আছে।

তালাল দেখান, ইসলামে আত্মোৎসর্গ বলে কিছু নেই। ইসলামে মানুষ যাতে হত্যা করতে না হয়, সেজন্য পশু কুরবানির কথা আছে— এটা হজরত ইবরাহিমের শিক্ষা। বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা এবং ভুল থেকে ফিরে আসার কাফ্ফারা হিসেবে উৎসর্গের কথা আছে। এর বাইরে আত্মঘাতী বোমারুর কায়কারবার ইসলামের

চৌহদ্দিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। তালালের কথা হলো, স্ট্রেনস্কি তাহলে এসব কোথায় পেলেন?

এরপরে মে জায়ুসি (May Jayyusi) লেখেন ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অপমান, নিগ্রহ ও জুলুম থেকে বাঁচবার জন্য এই ধরনের আত্মোৎসর্গের কৌশল তৈরি হলেও শেষ বিচারে আত্মদানের মতো ধর্মীয় ধারণা এর সাথে জড়িয়ে আছে। জায়ুসি দেখান অসলো (Oslo) চুক্তির ব্যর্থতা ফিলিস্তিনিদের জাতি হিসেবে এক সম্মিলিত বেদনার সমুদ্রে ফেলে দেয়। জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। জাতীয় হতাশার এক চূড়ান্ত পরিণাম এই আত্মঘাতী বোমা। জায়ুসি লেখেন, ইসরাইলিদের দখলদারি রুখতে না পারলেও এভাবে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

জায়ুসি তার উপসংহার টানেন দার্শনিক জিওরজিও আগামবেনের (Giorgio Agamben) হোমো সেসার ধারণাকে উল্টে দিয়ে। হোমো সেসারকে হত্যা করা যায়। তাকে দিয়ে আত্মোৎসর্গ হয় না। জায়ুসির কথা হলো, আত্মোৎসর্গকারী সার্বভৌমত্বের সাপেক্ষে এই সমীকরণ উল্টে দেয় এবং নিজেকে এমনভাবে বদলে দেয়, যাকে উৎসর্গ করা যায়, হত্যা করা যায় না।

জায়ুসি স্ট্রেনস্কির ধারণা থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাথে আত্মোৎসর্গকে যুক্ত করলেও আত্মোৎসর্গকে তিনি ধর্মীয় পটভূমিতে দেখেছেন এবং সেটাকে ফিলিস্তিনিদের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। জাতির জন্য আত্মদান ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী হওয়ার পথ দেখিয়েছে। এটাকে তিনি ইসলামি সভ্যতার শরিক বলে মনে করেন। ইসলামের ভেতরে একটা মৃত্যুর সংস্কৃতি আছে। তবে আগেই বলেছি, তিনি এই ঘটনার কারণ হিসেবে ইসলামকে মনে করেন না। এর কারণ ইসরাইলি দমননীতির মধ্যে।

তালাল এখানে হস্তক্ষেপ করেন। তার কথা, মৃত্যুর সংস্কৃতি কেবল ইসলামের মৌরসি পাট্টা নয়। উদারনৈতিক সভ্যতাও কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য, জাতিরাষ্ট্রের জন্য মরণকে তুচ্ছ করার কথা বলে।

ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্রুনো এতিয়েন (Bruno Etienne) একজন উত্তর আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ। তিনি তার ইতিহাস জ্ঞান দিয়ে

বলার চেষ্টা করেছেন, আরব জগতে রক্তপাতের ঐতিহ্য অনেক লম্বা। কিন্তু তিনি এটা পরিষ্কার করে বলতে পারেননি, আত্মঘাতী বোমার সংস্কৃতি কি আরব জগতে ঐতিহাসিক কাল ধরে চলা সন্ত্রাসের যোগফল, না এটা আরবীয় সন্ত্রাসের যে ঐতিহ্য, তার ধারাবাহিকতা। এখানে তিনি সিগমন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) সাহায্য নিয়েছেন। ফ্রয়েড তার মনোসমীক্ষণ বিদ্যা ঘেঁটে বলেছেন, আদিম যুগে মানুষ তার গোত্রপিতাকে হত্যা করেছিল। পশুহত্যা তার পুনরাবৃত্তি। আত্মহত্যা, আত্মোৎসর্গ পশু হত্যার মতো— মূলে সেই পিতৃহত্যার নতুন সিলসিলা। এতিয়েন ফ্রয়েডের এই যুক্তিকে মান্য করে প্রস্তাব করেছেন, ইসরাইলের তুমুল পীড়নের মুখে ফিলিস্তিনিদের যে আত্মধিক্কার ও আত্মগ্লানি জন্মেছে, তা পরহত্যা বাসনায় রূপ নিয়েছে। তালাল এতিয়েনের এই ইচ্ছামতো ফ্রয়েডকে ব্যবহার করার নিন্দা করেছেন। ফ্রয়েড দেখান, মানুষের ভেতরে জীবনকে দীর্ঘায়িত করা ও মৃত্যু অভিমুখিতার ইচ্ছা— দুটোই সমান সমান। এতিয়েন সেখানে একটাকে প্রধান করে এক ধরনের ভুল ব্যাখ্যা আরোপ করতে চেয়েছেন। সেটা সংগত হয়নি। কোন মানুষ কীভাবে মরতে চায়— এটা ফ্রয়েডের আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের আলোচনায় দেখা যায়, মানুষের জীবন ও মৃত্যু ইচ্ছা— দুটোই আগ্রাসী প্রবৃত্তি, যা ব্যক্তিমানস ও তার নিজস্ব ইচ্ছাকেও অতিক্রম করে যায়। তালাল দেখান, এই আগ্রাসী প্রবৃত্তি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে। কিন্তু এই যুদ্ধ তো অসভ্য জাতিদের থেকে সভ্য জাতিরাই বেশি ভালোভাবে করতে পেরেছে।

রবার্ট পাপ (Robert Pape) নামের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দাবি করেন, আত্মঘাতী বোমা যুদ্ধের একটা কৌশল। এর প্রমাণ হচ্ছে, এটা শুধু ফিলিস্তিনিরাই করে না, অনেকেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। তিনি শ্রীলংকার উদাহরণ দিয়ে দেখান, ১৯৮১ থেকে ২০০১ সালের ভেতরে ১৮৮টির মধ্যে ৭৫টি তামিলরা ঘটিয়েছে। পাপ আরো দেখান, আত্মঘাতী বোমা ঠিক কার্যকর পদ্ধতি নয়। ফিলিস্তিনই তো তার প্রমাণ। এর ফলে ইসরাইলের পক্ষে পশ্চিমের জনমত তৈরি হয়।

তালাল আরেকজন বিশেষজ্ঞের কথা বলেছেন। এর নাম রোকসান ইউবেন (Roxanne Euben)। ইনি আত্মঘাতী বোমার তাৎপর্য

ব্যাখ্যা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হানা আরেন্টের (Hannah Arendt) চিন্তাভাবনা ধরে। তিনি দেখান, জিহাদ কোনো পরকালে প্রবেশের চাবি নয়, কিংবা দুনিয়াবি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য রক্তাক্ত লড়াই নয়। তাহলে জিহাদটা কী? ইউবেন হানা আরেন্টের ভাষা ধার করে লিখেছেন, জিহাদ এক ধরনের রাজনীতি। এই রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়াবি জীবন পার করে অবিনশ্বরতার জগতে পৌঁছানো। কিন্তু অবিনশ্বর জগতে পৌঁছে যাওয়ার মন্ত্রটা এই পার্থিব জগতের মধ্যে নিহিত। এর নাম তামাম দুনিয়ায় ইনসাফের রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ইউবেন এ সূত্রে আধুনিক কালের দুজন গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের তাত্ত্বিক মওদূদী ও কুতুবের নজির দিয়েছেন। এদের কথা— জিহাদ হলো জাহিলিয়াকে অতিক্রম করে উম্মাহকে স্থলাভিষিক্ত করা, যেটা হচ্ছে মুসলমানদের ন্যায়রাজ্য। এই জায়গায় ইউবেন আত্মঘাতী বোমার চিন্তাকে প্রেরণা বা ব্রত থেকে সরিয়ে এনেছেন, যেমন— ধর্মীয় আত্মোৎসর্গ (স্ট্রেনস্কি), রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে পলায়ন (জায়ুসি) ও মৃত্যুইচ্ছা (এতিয়েন)।

ইউবেন রাজনীতিকে কম নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। জিহাদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের যুদ্ধকৌশল ইউবেনকে মোটেও টানেনি। কিন্তু যে উদ্দীপনা এদের রাজনীতিকে মানবীয় নশ্বরতা, আগ্রাসী মৃত্যু ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্ত করেছে, তা তাকে ভাবিয়েছে। ইউবেন দেখান, যদিও বলা হয় রাজনীতির সাথে সন্ত্রাসের যোগ নেই, কিন্তু সত্য হলো— এথেন্সের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সন্ত্রাসের ভেতর দিয়ে। আজকের উদারনৈতিক রাষ্ট্রগুলোর ইতিহাসও তাই। সন্ত্রাস উদারনৈতিক চিন্তা ও চর্চার ভেতরে আছে। এই কারণে নয় যে, উদারনৈতিক রাষ্ট্রগুলোর সেনাবাহিনী কিংবা কারাগার দরকার; বরং এই কারণে যে, সন্ত্রাসই উদারনৈতিক রাষ্ট্রের আইন তৈরি করেছে, যেমন রাজনৈতিক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে :

> Violence is therefore embedded in the very concept of liberty that lies at the heart of liberal doctrine.[৪০]
>
> [সহিংসতা তাই স্বাধীনতার ধারণার মধ্যেই নিহিত, যা উদারনৈতিক মতবাদের মূলে রয়েছে।]

ইউবেনের কথার সূত্র ধরে তালাল আরো বলেন, সন্ত্রাস ছাড়া উদারনৈতিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠা সম্ভব নয় :

> The absolute right to defend oneself by force becomes, in the context of industrial capitalism, the freedom to use violence globally.[৪১]
>
> [শিল্পপুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে নিজেকে শক্তি দ্বারা রক্ষা করার নিরঙ্কুশ অধিকার বিশ্বব্যাপী সহিংসতা ব্যবহারের স্বাধীনতায় পরিণত হয়।]

তালাল প্রশ্ন করেন, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর আত্মরক্ষার জন্য যদি আণবিক অস্ত্র লাগে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তা মেনে নেয়— তাহলে সে অর্থে আত্মঘাতী বোমাও বৈধ জিনিস। এ থেকেই তালাল বলতে চান, আত্মঘাতী বোমারুরা একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে মুক্ত করার জন্য আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহ্যের সশস্ত্র পথকে বেছে নিয়েছে মাত্র।

তালালের তৃতীয় ও শেষ বক্তৃতার নাম Horror at Suicide Terrorism। এখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ধারণা হিসেবে ভয়, আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী বোমার একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া কীভাবে দাঁড়ায়। একদিকে তিনি নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করে দেখাচ্ছেন ভয় কী করে সামাজিক ও ব্যক্তি পরিচয়কে ধ্বসিয়ে দেয় এবং গঠনকে দ্রবীভূত করে ফেলে। অন্যদিকে তিনি খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে দেখান, যিশুর ক্রুসে মৃত্যুটা হলো ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো আত্মহত্যা। এটা এক ধরনের ভীতি উৎপাদন করেছে। এই ভীতি রূপ বদলিয়ে বিশ্ব মানুষের নব উত্থানের প্রকল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এভাবে আবার নিষ্ঠুরতা ও সহানুভূতি একত্রিত হয়েছে। তালালের বইয়ের এ অংশটুকু হচ্ছে সবচেয়ে চিন্তার জায়গা। অবশ্য তালাল এটা বলতে ভোলেননি, আত্মঘাতী বোমা দ্বারা উৎপাদিত ভীতির স্তরভিত্তিক বর্ণনা এর সাথে জড়িয়ে আছে।

তালাল তৃতীয় ওয়েলেক লেকচারে এ প্রশ্নটা তোলেন, কেন পশ্চিমের মানুষ আত্মঘাতী বোমার ঘটনায় এত শিহরিত হয়? পৃথিবীতে কি আর নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে না? প্রতিনিয়ত গোপনে-প্রকাশ্যে কর্তৃত্বপরায়ণ বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা, ফৌজদারি ও কারাগার ব্যবস্থা,

বর্ণবাদনির্ভর অভিবাসন পদ্ধতি ও জাতিগত নির্মূলীকরণ, জুলুম ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ— সবই আজকের পৃথিবীতে দৃশ্যমান। তাহলে উদারনৈতিকতাবাদীরা আত্মঘাতী বোমা নিয়ে কেন এত স্পর্শকাতর? কেন এই বিষয়ে এত বইপত্র, নিবন্ধ লেখালেখি এবং টিভি প্রতিবেদন ও ছবি নির্মাণ করা হয়?

তালাল দেখান, আধুনিক কালে যে হত্যা ও মৃত্যুর ধারণা, তা আসলে জুডিও-ক্রিশ্চান কালচারের অংশ। এক্ষেত্রে তিনি বিলাতের মনোঃসমীক্ষণবিদ জ্যাকুলিন রোজের (Jacqueline Rose) বরাতে বলেন, আত্মঘাতী বোমার ঘটনায় এত শিহরণ, আতঙ্ক ও ভয়ের কারণ হলো, আক্রান্ত ও আক্রমণকরী একই সাথে মারা যায়। গুচ্ছ বোমার (cluster) নিষ্ঠুরতাও উদারনীতিকরা সহ্য করেন। কিন্তু নিজেকে রক্ষা না করে আক্রান্তকে নিয়ে যে মৃত্যু, তার কোনো কারণ তারা খুঁজে পান না। এই শিহরণ বা আতঙ্কের উৎস জ্যাকুলিন খোঁজেন আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর নৃশংস মিলনের ভেতরে :

> Suicide bombing is an act of passionate identification—you take the enemy with you in a deadly embrace.[৪২]
>
> [আত্মঘাতী বোমা হামলা হলো আবেগময় একাত্মতার একটি কাজ— আপনি শত্রুকে এক মারণ আলিঙ্গনে আপনার সাথে নিয়ে যান।]

জ্যাকুলিন প্রচলিত যুদ্ধ, যেমন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ও জার্মানিতে নিবিড় বোমাবর্ষণের যে নৃশংসতা, তার সাথে আত্মঘাতী বোমার নৃশংসতার তুলনা করেন। জ্যাকুলিন দেখান, শিহরণ বা আতঙ্ক খোদ আক্রমণকারীর মৃত্যুর মধ্যে। এটা জ্যাকুলিনের প্রথম প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, যারা এই শিহরণের অভিজ্ঞতা নেয়, তারা বুঝে উঠতে পারে না আক্রমণকারীর নৈতিক অবস্থানকে। নিজেকে রক্ষা করে শত্রু খতম করার চেয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে শত্রু খতম করা কোন নীতির বিচারে খারাপ? জ্যাকুলিনের দ্বিতীয় প্রস্তাব আমাদেরকে সেই পুরোনো জায়গায় নিয়ে যায়— কোন মতলবের কারণে আত্মঘাতী বোমারু নিজের জীবন নিজে খতম করে? তালাল বলেন, জ্যাকুলিন খুবই উঁচু

মাপের আলোচক হলেও প্রত্যক্ষদর্শীর শিহরণের অনুভূতিকে পুরোপুরি ধরতে পারেননি। তাহলে কেন এই শিহরণ? এই মৃত্যু, এই নৃশংসতা, এমনকি আত্মঘাতী বোমারু ছদ্মবেশে, নির্দোষিতার পোশাকে 'আসে হঠাৎ করে কাউকে না জানিয়ে, মুহূর্তে সব স্বাভাবিক জীবনকে তছনছ করে দিয়ে যায়। এই হঠাৎ মৃত্যু প্রবল আবেগের জন্ম দেয়— ক্ষোভ, ভয়, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা— শেষ পর্যন্ত শিহরণ। কিন্তু এরপরেও প্রশ্ন থাকে

হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই বোমা ছোড়া হয়েছিল দেশে দেশে মাটিতে পুতে রাখা মাইনে সতর্কতা ছাড়া হঠাৎ করেই বহু মানুষ মারা যায়, পঙ্গু হয়। সেখানে কেন এই শিহরণ জাগে না? শ্রীলঙ্কায় বহু আত্মঘাতী ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমারা তাতে শিহরণ বোধ করেনি। কিন্তু অ-পশ্চিমারা কোনো পশ্চিমাদের হামলা করলে এত শিহরণের খবর চাউর হয় কেন? তালাল এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। পশ্চিমারা বা যারা তাদের অনুসারী, তারা নিজেদেরকে বলে আধুনিকতাবাদী, গণতন্ত্রী, সেকুলার। প্রয়োজনে দেশকে, গণতন্ত্রকে যে-কোনো মূল্যে তারা রক্ষা করার কথা বলেন। এই যে-কোনো মূল্যের অপর নাম জীবন। দেশের জন্য জীবন দেওয়া জাতিরাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে প্রায় ধর্মের সমান পবিত্র। এরা মারা গেলে এদেরকেও শহিদ বলা হয় বা লড়াকুদের মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়। এখানেও জীবনদানের বৈধতা আমরা দেখি। তালাল একটা দারুণ প্রশ্ন করেন— এই আত্মঘাতী বোমারুদের কাজকর্মের ভেতরে কি আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই না? কিন্তু, অন্যরা যখন একই কাজ করে, যাকে আমরা বহুদিন ধরে স্বাভাবিক হিসেবে দেখছি, সেটাই অস্বাভাবিক হিসেবে ধরা পড়ে। উদারনৈতিকতার এই ধরা পড়াটা আত্মঘাতী বোমার শোরগোলের মধ্যে চাপা পড়ে যায়। তখন ঘটানাটাকে আমরা শুধু শিহরণ হিসেবে চিনতে পারি।

আধুনিকতার দাবিদাররা কিন্তু দেশের জন্য আত্মদানের কথা বললেও, তাদের কথা তারা ধর্মসংস্কার থেকে মুক্ত, স্বাধীন। তাদের স্বাধীনতা দুনিয়াদারির স্বাধীনতা, আখিরাতের নয়। জাতিরাষ্ট্রের পক্ষে তাদের এই আবেগ কিন্তু ধর্মীয় আবেগের চেয়ে মোটেই কম নয়। আত্মহত্যাকারী বোমারুরা তাই আধুনিক মানুষের নেমেসিস। বোমারুরা উদারনৈতিকতার এই গোপন কথা ফাঁস করে দেয় বলেই এত শিহরণ।

তালাল দেখান, আত্মঘাতের ঘটনা জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান কালচারে দেখা যায়। আধুনিকতা সেটি গ্রহণ করে স্ববিরোধী আকারে। আত্মঘাতের ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। অনেক দিন ধরেই এটা চলছে। শুধু আত্মঘাতী বোমারুকে স্বাধীনতার সৈনিক বলাতেই আধুনিকতার যত ওজর-আপত্তি। তালালের লেখা থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে— সমস্যাটা আসলে লিবারেলিজমের ভেতরে। অন্যথা লিবারেলিজমের সাথে দাসপ্রথা, পররাজ্য গ্রাস, ঔপনিবেশিক শাসন এক সাথে থাকে কী করে? হিটলারকে যুদ্ধবাজ রাজনীতির জন্য আজো জগতের মানুষ বদদোয়া করে। কিন্তু সেই কাজ পশ্চিমের উদারনৈতিকরা আরো বেশি করার পর কোনো কথা ওঠে না কেন? এটাই লিবারেলিজম।

হজরত ইবরাহিম থেকে আসা তিনটি ধর্মেই আত্মহত্যা শুধু নিষিদ্ধ নয়, রীতিমতো পাপ। জীবন যিনি দেন, কেবল তিনিই নেয়ার অধিকার রাখেন। নিজ জীবনের ওপর মানুষের সার্বভৌমত্ব নেই। কোনো ধর্মই তা দেয়নি। কিন্তু কোনো অন্যায়ের ফলে খোদা জীবন নেওয়ার অধিকার রাখেন। সেই বরাতে খোদার প্রতিনিধি বা আজকের জাতিরাষ্ট্র সেই কাজটা করে। আত্মহত্যা এমন একটা অপরাধ, যেটা কিনা অতুলনীয় স্বাধীনতার নমুনা— সেটা ধর্ম বা রাষ্ট্র কেউ অনুমোদন করে না। যে-কোনো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি যেন আত্মহত্যা না করতে পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধরত সৈনিক, বন্দী আসামি, মুমূর্ষু রোগী— কারো এই অধিকার নেই।

প্রাচীন কালে আত্মহত্যা পাপের বিষয় ছিল না। কিন্তু এই অধিকার ছিল এলিটদের। দাসদের এ অধিকার ছিল না। পৃথিবীতে বিপুল আলোচিত হওয়ার ঘটনা সক্রেটিসের বিষপানে মৃত্যুবরণ। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তাকে আত্মহত্যার হুকুম দিয়েছিল। নিটশে মনে করেন সক্রেটিসের এমনভাবে মরা উচিত হয়নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করে মরা উচিত ছিল। নিটশের যুক্তিকে মানতে হলে হজরত ঈসার আত্মহত্যাও মেনে নেওয়া যায় না। আত্মহত্যা বা মৃত্যু নিয়ে নিটশের আগ্রহ নেই। তার কাছে অন্যায় হলো আত্মসমর্পণ।

জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত হজরত ঈসার আত্মহত্যা কিন্তু একটি ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে— এর ভেতরকার ভয়ের সম্ভাবনাকে

বদলিয়ে একটি নৈতিক ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে হাজির করা হয়েছে এবং অর্জিত চেতনাকে একটি সৃষ্টিশীল উপাদানে পরিণত করা হয়েছে। এই ইতিহাস অনুসারে খোদার পুত্র হজরত ঈসা মানবতাকে বাঁচানোর জন্য স্বেচ্ছায় জীবন দেন। এটা একটা চূড়ান্ত আত্মত্যাগ। তিনি নিজেকে হত্যা করেননি। হত্যাকাণ্ডে বাধাও দেননি। পালিয়েও যাননি। বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। প্রকাশ্য নির্যাতনেই তার মৃত্যু হয়। তিনি নিজেই এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর পথ বেছে নেন। এটা কি একরকম পরোক্ষ আত্মহত্যা? খ্রিষ্টানরা মনে করেন, যেভাবেই মৃত্যু হোক, মানবজাতির মুক্তির জন্য তিনি এটা করেছেন।

খ্রিষ্টান জগতে ক্রুশে মৃত্যু একটা আইনি শাস্তি। এখানে অপরাধীর কষ্টকে একটা দায়শোধের মতো দেখা হয়, যাতে পৃথিবীতে সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা ফিরে আসে, হারিয়ে যাওয়া গুণসমূহ আবার প্রত্যাবর্তন করে। এটা মৃত্যুর ভেতর দিয়ে পাপমোচনের একটা উদাহরণ হয়ে ওঠে।

হজরত ঈসার পরোক্ষ আত্মহত্যা ও প্রকাশ্য নির্যাতন ভোগ একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এটা একদিকে মানুষের জন্য মহান উপহার, অন্যদিকে অন্যায্য কষ্টভোগ। তালাল বলেন, এই দ্বন্দ্বটাই উদারনৈতিক মানবতাবাদের ভেতরে প্রতিধ্বনি করে। একদিকে তারা নাগরিকদের এক বিশেষ ধরনের জীবন তৈরির জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগের কথা বলে, অন্যদিকে আইনি শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। উদারনীতিকরা অনুশোচনার ভেতর দিয়ে নৈতিক উন্নতির কথা শুনে অবাক হয়। তারা নিষ্ঠুরতার ভেতরে মানুষকে নিক্ষেপ করার চেয়ে অনুশোচনার ভেতর দিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক মুক্তির ধারণায় উদ্বিগ্ন হয় বেশি। ক্রুশে মৃত্যুর ব্যাপারটা একজন নিরপরাধ মানুষকে ঐশ্বরিক পরিকল্পিত শাস্তিদান মাত্র, মানবতার অপরাধের জন্য একজনের প্রতিনিধিসুলভ শাস্তিভোগ। এটা একটা ভয়াবহ উপহার বহন করে— একটা নিষ্ঠুর মৃত্যুর বিনিময়ে চিরকালীন জীবন। এই সুমহান কৃতিটা নির্ভর করে দ্বান্দ্বিকভাবে একটি চূড়ান্ত আকৃতির ওপর। হজরত ঈসার সাথে তার শিষ্য জুডাস সরাসরি বেঈমানি করে। আর তিনি তাকে সাহায্য করেন। বাইবেলে এর বিবরণ

রয়েছে। বাইবেলের এই বিবরণ থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বড়ো অকৃতি মানবতার সবচেয়ে কল্যাণের পথ খুলে দেয়। এই আত্মত্যাগ একদিকে নিষ্ঠুরতার, অন্যদিকে মানুষের নির্বিকার উদাসীনতার। এইভাবে খ্রিষ্টীয় সভ্যতায় আত্মহননের ভেতর দিয়ে মানবতাকে জীবন উপহারের বন্দোবস্ত হয়। মুক্তি নির্ভর করছে নিষ্ঠুরতার ওপর, অন্তত পক্ষে জীবনকে উপেক্ষা করার অপরাধের ওপর।

এসব দেখে তালালের মতামত— আত্মোৎসর্গ, রক্তপাত ও মৃত্যু— প্রাক উদারনৈতিক এসব খ্রিষ্টান ধর্মের বৈশিষ্ট্য আজকালকার উদারনৈতিকদের খুব না-পছন্দ। অথচ কাজের বেলায় দেখা যায়, এসবের অনেক কিছুই উদারনৈতিকতার উত্থান পর্বের সাথে জড়িয়ে আছে। এ কালের আধুনিক সংস্কৃতিতে এটা জড়িয়ে আছে। 'ন্যায় যুদ্ধের' কথা কেবলমাত্র এখনকার কথা নয়।

সবশেষে বলা দরকার, তালাল আমাদেরকে এ বইয়ে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পথ দেখান। সন্ত্রাসবাদ খারাপ, ইসলামি সন্ত্রাসবাদ আরো খারাপ। কিন্তু সেই খারাপের কার্যকারণ আছে। ওটা আমরা অনেকেই জানি। তালালও সেটা অস্বীকার করেন না। কিন্তু উদারনৈতিকতা যে প্রশ্নোর্ধ নয়, তালাল সেটা ধরিয়ে দেন। অন্তত এই জায়গায় এসে তালালের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কায়দাকানুন আমাদের বেশ কাজে লাগে।

আট.

২০০৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টাউনসেন্ড সেন্টার ফর দ্য হিউম্যানিটিজে Is Critique Secular? বলে একটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এখানে তালাল আসাদ, ওয়েনডি ব্রাউন, জুডিথ বাটলার ও সাবা মাহমুদের মতো উত্তর-সেকুলার, উত্তর-কাঠামোবাদী পণ্ডিতরা অংশ নেন। এইসব পণ্ডিতরা কম-বেশি তালাল আসাদ ঘরানার। এই সিম্পোজিয়ামের একটা পটভূমি ছিল। ২০০৫ সালে ডেনমার্কের পত্রিকায় রসুল স.-কে নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কার্টুন প্রকাশিত হয়। এতে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয় ও প্রতিবাদ করে।

ইউরোপের পণ্ডিতরা তখন বলতে শুরু করে— মুসলমানরা সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। কারণ, এটা তাদের ঐতিহ্যে নেই ক্রিটিক ও সমালোচনা যুক্তিশীল মনের পরিচয়, যা ইউরোপকে আলোকিত করেছে। ইউরোপে থাকতে হলে এই যুক্তিশীল ঐতিহ্য. সমালোচনা সহ্য করে নিতে হবে। এই পটভূমিতে উপরোক্ত সিম্পোজিয়ামে প্রশ্ন ওঠে— যে ক্রিটিককে ইউরোপের চিন্তার ভিত হিসেবে ধরা হয়, সেটি কতটুকু সেকুলার বা সেই ক্রিটিকের সীমানা বা সীমাবদ্ধতা কতটুকু? সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ ও আলোচনা পরবর্তীতে এই পণ্ডিতদের সম্পাদনায় *Is Critique Secular? Blasphemy, Injury and Free Speech* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে তালাল আসাদের Free Speech, Blasphemy and Secular Criticism বলে একটি লেখা আছে বইয়ের ভূমিকায় সম্পাদকবৃন্দ লিখেছেন, এই শিরোনাম দেওয়ার অর্থ হলো এটা বোঝার চেষ্টা করা— সেকুলার ভাবনাটা কি পুরোপুরি ধর্মীয় ভাবনার বিপরীত বিষয়? অথবা ক্রিটিক মানেই সেকুলার এবং সংজ্ঞানুসারে ধর্মে যাকে গোঁড়ামী ও অন্ধতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার বিপরীতে সেকুলারিজম মানে ক্রিটিক ও আত্মপর্যালোচনা— এই অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করা।

ক্রিটিক মানে সেকুলার— বর্তমানে চালু এই অনুমানটার অর্থ সেকুলারিজম একটা বিষয়কে প্রশ্ন বা সমালোচনা করতে পারে বা এটা একটা চিন্তাপদ্ধতি অথবা এটা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে চিন্তাগত অবস্থানটাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করা যায়। ক্রিটিক ও সেকুলারিজম ধারণাটা ডিসকার্সিভ ট্র্যাডিশনের ভেতরে গড়ে ওঠে— যাকে বিশেষ কোনো ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বারা অ-প্রভাবিত বিশ্বজনীন ও অগ্রাধিকারভিত্তিক ধারণা হিসেবে ধরা হয়। চিন্তা হিসেবে সেকুলারিজম ধর্মের বিপরীতে হাজির হয়ে থাকে, যাকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের বাইরে যুক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতা আকারে বোঝা হয়। আর ক্রিটিক হাজির হয় সনাতন পন্থা, গোঁড়ামি ও মৌলবাদের বিপরীতে ধর্ম ও আনুগত্যের বাইরে স্বচ্ছতা ও যুক্তিশীলতার কাব্য হিসেবে। কতকগুলো অনৈতিহাসিক ও অগ্রাধিকার ক্যাটাগরিকে ধরে ক্রিটিক নিয়ে উপরের আলোচনা কিছু বাইনারি তৈরি করে— ধর্ম ও

সেকুলারিজম, সমালোচনা-সনাতন পন্থা, যুক্তি-বিশ্বাস, বিচার-আনুগত্য, সত্য-বিশ্বাস, স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতা। এই বাইনারির চোখ দিয়ে সেকুলার ব্যক্তি ও সমাজ নিজেদেরকে যুক্তি ও পর্যালোচনার প্রতি নিবেদিত হিসেবে ধরে নেয়। এই বয়ান সেকুলারিজমকে একটি সুবিধাজনক অবস্থা দেয়, যার ভেতর দিয়ে ধর্মীয় ধারণাটাকে তৈরি ও ব্যাখ্যা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত সেকুলার নামক বয়ানটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিসরে বড়ো রকমের প্রভাব ফেলে।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর লেখকরা চলমান ধর্ম— সেকুলারিজম বাইনারিকে ভাঙ্গার ও সমস্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন এবং বাইনারি ধারণার বাইরে যেয়ে ধর্ম ও সেকুলারিজমকে জিনিয়লজিক্যাল পদ্ধতিতে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই লেখকরা একই সাথে সেকুলারিজম যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে মোটেও নিরপেক্ষ থাকে না, সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

তালাল তার লেখাটিকেও ডেনিস কার্টুনের পটভূমিতে খাঁড়া করেছেন এবং সেকুলার উদারনৈতিক সমাজে ব্লাসফেমির মতো ধর্মভিত্তিক ধারণার সাথে বোঝাপড়া করেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন— ব্লাসফেমির উদারনৈতিক ব্যাখ্যাটা খ্রিষ্টীয় চিন্তাকাঠামোর ভেতর থেকে উঠে আসা সেকুলারায়নের পশ্চিমা বয়ানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বয়ান তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি ও যুক্তির সাথে লাগোয়া সেকুলার সমালোচনার সাথে নির্যাতন, অস্পষ্টতা ও অসহিষ্ণুতার সমার্থক ইসলাম ধর্মীয় সমালোচনার ধারার ভেতর একটা বাইনারি গড়ে তোলে। এই যুক্তিতে ব্লাসফেমিকে বলা হয় Sign of civilizational identity[৪৩]।

এই চিহ্ন আসলে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দাগা হয়। এটা দিয়ে বোঝানো হয় মুসলমানরা স্বাধীনতার গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। এই যুক্তি ইউরোপীয় মুসলমানদের একটি আদর্শিক ক্যাটাগরিতে সঙ্কুচিত করে নিয়ে আসে, যারা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও রাজনৈতিকভাবে পরিণত মানব হয়ে উঠতে পারেনি।

পুরো প্রবন্ধটি জুড়ে তালাল এই বাইনারি ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন এবং উদারনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরের মধ্যে বিশ্বাস, ধর্ম, সত্য, ব্লাসফেমি,

কর্তাসত্তার মতো বিষয়গুলো নিয়ে জটিল আলাপ করেছেন। এটা করতে যেয়ে তিনি গ্রিক দর্শন, কান্ট, মার্কস, পোপ বেনেডিক্ট-১৬ থেকে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনি ঐতিহ্য, ধর্মদ্রোহের দায়ে আবু জায়েদের বিচার এবং প্রলুব্ধ করার ইসলামি ধারণা— এমন কোনো বিষয় নেই যা তিনি আলাপ করেননি।

এ প্রসঙ্গে তালাল পোপ বেনেডিক্টের আলাপটা স্মরণ করেন। পোপ ২০০৬ সালে দেওয়া রোজেনবার্গ লেকচারে বলেন, বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে গ্রিক যুক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা খ্রিষ্টান ধর্ম বনাম যুক্তিতে অবিশ্বাসী ইসলামের সাথে একটা সভ্যতাগত দ্বন্দ্ব আছে। গণতন্ত্রের জন্য বাক্-স্বাধীনতাকে খুবই জুরুরি মনে করা হয়। পোপের নীতিগত অবস্থান ও ডেনিশ কার্টুনের সমর্থকদের সাথে সুর মিলিয়ে এটা মনে করা হয়— গণতন্ত্র খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে প্রোথিত এবং এটা ইসলামের সাথে যায় না। এটা বিশ্বাস করা হয়— খ্রিষ্টান ধর্ম গণতন্ত্রের জন্য গ্রহণশীল, কেননা এটা চার্চ ও রাষ্ট্রকে পৃথকভাবে দেখে।

তালাল মনে করেন এই ধারণা সমস্যামূলক এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন— বাইজান্টাইনদের সময় চার্চ ও রাষ্ট্র এক ছিল, যে সময় মূল খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব তৈরি হয়। মধ্যযুগে এবং তারপরেও চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি এবং রাজনৈতিক বৈষম্য আইনিভাবেই স্বীকৃত ছিল। সমানাধিকারের ধারণা নানা রকম সামাজিক ও আদর্শিক প্রশ্ন দ্বারা বরং জটিলতর হয়েছে।

এরপর তালাল ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার (Francis Fukuyama) উদাহরণ নিয়ে আসেন। ফুকুয়ামা গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক সমতার ভেতর দিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের সর্বজনীন মানব মর্যাদার ধারণার (universal dignity of man) সাথে যুক্ত করেন। তালাল দেখান, মধ্যযুগে dignitas শব্দটা ব্যবহার হতো সুবিধাপ্রাপ্ত উঁচু শ্রেণির মানুষের জন্য, সব মানুষের সমতার জন্য নয়। খ্রিষ্টান ধর্মের একটা সর্বজনীন আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার আছে (ইসলামেও আছে)। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক ও সামাজিক অসমতার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কেউ কেউ আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণার বীজ খ্রিষ্টান ধর্মের ভেতরে না খুঁজে প্রাচীন গ্রিসের নগররাজ্যের ভেতরে খুঁজেছেন। প্রাক-খ্রিষ্টীয় এথেন্সে সীমিত

আকারে হলেও এক ধরনের সমতা, নাগরিকতা, গণতান্ত্রিক চর্চা ও বাক্-স্বাধীনতার ব্যাপার ছিল। কিন্তু এটার কোনো সর্বজনীন মানব মর্যাদার ধারণা ছিল না। কেবল ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জগতে বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ভেতর দিয়ে অনেক ধরনের অসমতা দূর হয় এবং ধর্মের বদলে সেকুলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপরে তালাল মারকেল গশেটের (Marcel Gauchet) লেখা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, খ্রিষ্টান ধর্মের বীজ থেকে সেকুলার মানবতাবাদের জন্ম। এই প্রক্রিয়ায় খ্রিষ্টান ধর্ম তার নিজের অতিন্দ্রীয় চরিত্র বাদ দিয়ে এক ইহজাগতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আজকের পশ্চিমা সভ্যতার বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করছে (ধর্মের ভেতরে ডুবে থাকা মুসলিম সমাজ থেকে এটা ভিন্ন)। সব ধর্মের ভেতরে খ্রিষ্টান ধর্মই বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং মানুষের এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছে। সব ধর্মের দ্বারা মানবীয় এজেন্সি অস্বীকার করার প্রবণতা এভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম অতিক্রম করে এসেছে। পশ্চিমের 'খ্রিষ্টান ধর্মের' স্বর্গীয় পিতামাতা হওয়ার ধারণা থেকে এর মানব প্রজন্ম 'আধুনিকতার' সৃষ্টি এবং অতিন্দ্রীয়তার ভেতরে ইহজাগতিকতাকে আত্মস্থকরণের গল্পের ভেতরে একটা সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসারে জেসাস তার সকল স্বর্গীয়তাসহ পৃথিবীতে আসেন, মারা যান এবং মানুষের মুক্তির জন্য তার পুনরুত্থান ঘটবে। এই অতিন্দ্রীয়তার ধারণা সেকুলার ইউরোপীয় সভ্যতার ভেতরে ফিরে এসেছে, যদিও বিষয় ও স্থান ভিন্ন। এটা দেখেই সান্তিয়াগো জাবালা (Santiago Zabala) বলার চেষ্টা করেছেন— সেকুলারায়ন শুধু খ্রিষ্টান ধর্মের অতীতের সৃষ্টি নয়, উত্তর-খ্রিষ্টান পর্বে এসে খ্রিষ্টান ধর্মের সবল উপস্থিতিরও সাক্ষ্য দেয়।

এখন তালাল প্রশ্ন করেন, বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টান ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় সভ্যতার সাথে ইসলামি সভ্যতার দ্বন্দ্বকে কীভাবে দেখা যায়? রাজনৈতিক বয়ানের দিক দিয়ে দেখলে এ গল্প একটা ইউরোপীয় পরিচয় নির্মাণ করে। এ কথার অর্থ হলো, ইসলামি জগতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে মুসলমানরা ব্লাসফেমির মতো নিপীড়নমূলক ধারণাকে আঁকড়ে ধরেছে এবং স্বাধীনতার মূল্যকে অগ্রাহ্য করেছে। আসলে কি ঘটনাটা তাই?

তালাল দেখান, ইউরোপীয় সভ্যতা বলতে যা বোঝায়, তা আসলে শ্রেণি, বর্গ, জাতীয়তা, ধর্ম দ্বারা বিভক্ত। তারা কখনো কখনো নিজেদের ভেতরে দ্বন্দ্বে জড়ায় এবং সমালোচনার একই ঐতিহ্য দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে। অতীতে দেখা গেছে এই দ্বন্দ্বে কখনো কখনো মুসলিম রাজন্যবর্গকেও মিত্র বানানো হয়েছে। কখনো কখনো স্বাধীনতা, সমতা, স্থিতিশীল ব্যবস্থার কথা বলে বাক্-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পন্থাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় দেশগুলোর ইতিহাস (ভূমিপুত্রদের ওপর নির্যাতনসহ) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসও বটে। হানা আরান্ট (Hanaah Arendt) দেখান, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্ণবাদী রাজনীতি ইউরোপে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল। তালাল তাই যুক্তি দেন, গণতন্ত্র ও বাক্-স্বাধীনতা ইউরোপীয় সভ্যতার ভেতরকার অংশ এবং অসমতা ও নিপীড়নের সাথে ইসলামের যোগ— এ কথা দিয়ে আসলে কী দাবি করা হয় বা বোঝানো হয়, তা আসলেই বোঝা শক্ত।

উদারনৈতিক সমাজের জন্য বাক্-স্বাধীনতার ধারণা জরুরি মনে করা হয়। অন্যদিকে ব্লাসফেমিকে মনে করা হয় সেকেলে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মাত্র। তালাল প্রশ্ন করেন, যদি পশ্চিমা সভ্যতা খ্রিষ্টান ধর্মের ভেতর থেকে উঠে আসে, তবে তার ভেতরে ব্লাসফেমির ধারণা থাকতে পারে কিনা, যা সেকুলার হয়ে গেছে বলে দাবি করে? ব্লাসফেমির সাথে সেকুলার আইনি নিষেধাজ্ঞার কোনো সাদৃশ্যতা আছে কিনা? বক্তৃতা, ভাষা, আলাপন, কথাবার্তা বিষয়ে সেকুলার আইনের নিষেধাজ্ঞা বা সুরক্ষার ধারণা দিয়ে কি এটার দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'মানব' ধারণাকে ব্যাখ্যা করা যায়? কীভাবে এই মানবধারণা সেকুলার ও ধর্মকে পৃথক করে? ব্লাসফেমি যদি সীমালঙ্ঘনকে চিহ্নিত করে, তাহলে সেকুলার সমালোচনা কি মুক্তি নিশ্চিত করে? আধুনিক সমাজেও কথাবার্তা, বাক্-স্বাধীনতা নিয়ে অনেক রকম সীমাবদ্ধতা আছে। এখানে কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, বাণিজ্যিক গোপনীয়তার আইন আছে, যা কোনো না কোনোভাবে চিন্তা, ধারণা ও মতামত প্রকাশকে সীমিত করে। কোনো শিল্পকর্মের মেধাসত্ত্বকে লঙ্ঘন করে যদি অন্য কারো দ্বারা জনসমক্ষে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, তবে সেটাকে আমরা কী ধরনের লঙ্ঘন বলতে পারি?

তাহলে ব্লাসফেমির সাথে এই ধরনের লঙ্ঘনকে কীভাবে পৃথক করা যাবে? তালাল এখানে বলতে চান, উদারনৈতিক সমাজে কিছু আইনি শর্ত আছে, সেটা নির্ধারণ করে কী কথাবার্তা প্রকাশ করা যাবে এবং এভাবেই উদারনৈতিক সমাজে স্বাধীনতার ধারণাটা তৈরি হয়।

এ প্রসঙ্গে তালাল ইসলামি ঐতিহ্যে ফ্রি স্পিচ— বাক্-স্বাধীনতার ধারণাটা কী রকম, তার একটা নমুনা হাজির করেছেন। মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নসর হামিদ আবু জায়েদের বিরুদ্ধে আদালতে ব্লাসফেমির অভিযোগ ওঠে। কারণ, তিনি কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করার কথা বলেছিলেন। সত্য ও স্বাধীনতার কথা ইসলামি ঐতিহ্যে আছে, তবে সেটা খ্রিষ্টান ধর্মের মতো নয়। আদালতের এই বিচারিক প্রক্রিয়াকে কি তাহলে আমরা বাক্-স্বাধীনতার দমন হিসেবে দেখবো? এই মামলার সাথে জড়িত উকিল মোহাম্মদ সেলিম আল-আওয়া বলেন, শরিয়াহ চিন্তা-বিশ্বাস-বাক্-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। চিন্তার স্বাধীনতা মানে ব্যক্তি তার ভেতরে ইচ্ছামতো নিজের চিন্তাকে লালন করতে পারে, এমনকি সমাজের সাথে যদি সাংঘর্ষিক হয়, তাতেও অসুবিধা নেই। এ কারণে কেউ তাকে চাপ দিতে বা তল্লাশি চালাতে পারবে না। শরিয়াহতে চিন্তার স্বাধীনতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জনসমক্ষে সেই চিন্তা প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আছে। কারণ, সেটা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

উদারনৈতিকদের কাছে এটাই অদ্ভুত মনে হয়, কারণ তারা মনে করে জনসমক্ষে মতামত দেওয়াটাই স্বাধীনতা। আবু জায়েদের বিষয়টা চিন্তার স্বাধীনতার বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে এই অধ্যাপকের চিন্তার সামাজিক ও আইনি প্রতিক্রিয়া ও পরিণতির বিষয়টা। এই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা উদারনৈতিক সমাজেরও উদ্বেগের বিষয়।

তালাল এ প্রবন্ধে উদারনৈতিক সমাজে ক্রিটিকের সেকুলার ধারণাটা খুলে খুলে দেখান। ক্রিটিক সব সময় সেকুলার না-ও হতে পারে, ধর্মের নতুন রূপে আসতে পারে, এমনকি সমালোচনার কাঠামোতেই সমালোচনাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হতে পারে। তিনি ক্রিটিকের সেকুলার অসংগতিকে তুলে ধরেন এবং ক্রিটিক বা সেকুলার ধারণা বিশ্বজনীন— এটা নিয়েও প্রশ্ন করেন।

নয়.

তালাল আসাদ ২০১১ সালে রিয়াদে তার বিশ্ববিশ্রুত মরহুম পিতা মুহম্মদ আসাদকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামের জন্য একটি পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ লেখেন। এ নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল Muhammad Asad: Between Religion and Politics। এ প্রবন্ধটিতে তালাল তার পিতা মুহম্মদ আসাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনাচিন্তার সমালোচনা করেন এবং একটি বিপরীত অবস্থান নেন। এ প্রবন্ধটিকে ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক সম্ভাবনায় বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আসাদের সাথে তদীয় পুত্র নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত তালাল আসাদের চিন্তাভাবনাগত একটা মোকাবিলাও বলা যায়। তালাল প্রধানত পশ্চিমের লিবারেল রাষ্ট্রের অবস্থান থেকে পিতার সঙ্গে এই জ্ঞানগত তর্কে লিপ্ত হন। এখানে তিনি পিতার ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তোলেন।

তালালের পিতা মুহম্মদ আসাদ ইহুদি ধর্ম থেকে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই এক জীবনবীক্ষা থেকে আরেক জীবনবীক্ষায় পদার্পণ, এক ভাবাদর্শের জগৎ থেকে আরেক ভাবাদর্শের দুনিয়ায় প্রবেশের হৃদয়গ্রাহী কাহিনি মহাকাব্যিক ক্যানভাসে তিনি হাজির করেছেন *মক্কার পথ* বইয়ে। এটা শুধু নিছক ধর্মান্তরের কাহিনি নয়, এটা একটা সংস্কৃতিকে ভালোবাসার কাহিনি। একজন বুদ্ধিজীবীর এই নতুন জীবন ও সংস্কৃতিকে মননগত উদযাপনের কাহিনি। এই উদযাপনকে মুহম্মদ আসাদ বলেছেন Homecoming of the Heart— হৃদয়ের ঘরে ফেরা।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আসাদের বাকি জীবন কেটেছে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতাকে সমৃদ্ধ ও এগিয়ে নেওয়ার কাজে। এ-সময়ে তিনি পশ্চিমের ভোগবাদ আক্রান্ত সমাজের বিশ্লেষণ করেন, ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনাকে নতুন করে পর্যালোচনা করেন এবং নাকল, আকল ও ইরাদাকে ভিত্তি করে আজকের যুগের পৃথিবীর সাপেক্ষে ইসলামের এক নতুন বয়ান প্রস্তুত করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, মুহম্মদ আসাদ ছিলেন একই সাথে একজন মশহুর মুফাসসিরে কুরআন।

আমরা এখানে মুহাম্মদ আসাদের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা নিয়ে একটু আলোচনা করবো। কারণ, এই ভাবনাগুলোকে লক্ষ্য করে পুত্র তালাল তার সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেছেন। তালালের যুক্তিগুলো বুঝতে হলে আগে আমাদের মুহম্মদ আসাদের ভাবনার সাথে একটু পরিচিত হওয়া দরকার।

জন্মসূত্রে অস্ট্রিয়ান মুহম্মদ আসাদ পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ১৯৩২ সালে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতে আসেন। এখানে তিনি কবি ও দার্শনিক ইকবালের অনুরোধে থেকে যান এবং পাকিস্তান আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে শরিক হন। পাকিস্তান হাসিলের পর নতুন দেশটির সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সাথে তিনি কিছুটা সম্পৃক্ত হন। এ পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য কুরআন-হাদিসের মূলনীতিগুলোকে সামনে এনে বুদ্ধিবৃত্তিক ভঙ্গিতে আলোচনা করেন। এসব আলোচনা পরে 'ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি' হিসেবে কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবে তিনি কী বলতে চেয়েছেন?

মুহম্মদ আসাদ মনে করেন ইসলামি রাষ্ট্র হলো মুসলমানদের জন্য একটা যৌক্তিক প্রয়োজন। ইসলামি জীবন বা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র হলো পূর্বশর্ত। মুহম্মদ আসাদ মনে করেন আল্লাহর আইনকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন মানাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য ও দায়বদ্ধ থাকা। রাষ্ট্রকে ধর্মীয় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে কেন? আসাদ বলেন, আইন যদি ঐশী উৎস থেকে আসে, তবে তার কর্তৃত্ব চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয়। এই আইন সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের নৈতিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দেবে, অমুসলমানদের নিরাপত্তা, তাদের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করবে, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং জগৎব্যাপী ইসলামের শিক্ষাকে প্রচার করবে। এটাকে আসাদ 'পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত' বলেছেন।

মুহম্মদ আসাদ মনে করেন একটা ঐশী কর্তৃপক্ষের আনুগত্য মেনে জাতি ভেতর থেকে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সুষ্ঠু সামাজিক আচরণের কারণ হয়ে

উঠবে। এই সমাজ ভালোর পক্ষে দাঁড়াবে এবং খারাপের মোকাবিলা করবে। এভাবে তৈরি হবে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি। মুহম্মদ আসাদের রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতা ও আইন পৃথক জিনিস নয়— অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার।

তালাল তার পিতার এই রকম রাষ্ট্রচিন্তাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার প্রশ্নগুলোকে এভাবে সাজানো যায় :

১. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রশ্ন।
২. আল্লাহ ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রশ্ন।
৩. আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন।

মুহম্মদ আসাদের মত হলো— ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সুরক্ষিত থাকার অধিকার থাকবে। তাদের জীবন-জীবিকার কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। তবে তারা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এটাকে মুহম্মদ আসাদ অন্যায্য মনে করেন না। কারণ, এটা এমন একটা স্বীকৃতি, যেখানে অমুসলিমদের রাষ্ট্রের ঘোষিত আদর্শের আনুগত্য করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্র মুসলিম নাগরিকদের পূর্ণ আনুগত্য দাবি করবে। অমুসলিমরা যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রে দ্বৈত ভূমিকা রাখতে পারবে না, তাই এর একটা স্বীকৃতি দরকার।

তালালের কথা হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের নাগরিক হিসেবে বসবাস করা সম্ভব নয়, যখন রাষ্ট্রের নৈতিকতার ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের পার্থক্য একটা রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, তালাল বলেন, ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের কোনো কথা নেই। প্রাক-আধুনিক কোনো রাষ্ট্রে এরকম নজির নেই। তখন রাজনৈতিক আনুগত্য ঠিক হতো জাতি-গোষ্ঠী, মালিক-দাস, প্রভু-ভৃত্য, শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ধারণা এসেছে এনলাইটেনমেন্ট-উত্তর আধুনিক জাতিরাষ্ট্র থেকে। মুহম্মদ আসাদের কথা হলো— আধুনিক কালে ইসলামি ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে আধুনিক রাষ্ট্রের ভেতরে সেটা করতে হবে বা করা সম্ভব। মুহম্মদ আসাদের এই সিদ্ধান্ত তালালের পছন্দ হয় না। তিনি মনে করেন, তার পিতার প্রস্তাবিত রাষ্ট্র আদতে একটা আধুনিক রাষ্ট্রই।

কিন্তু তালাল এটা হয়তো খেয়াল করেননি, মুহম্মদ আসাদ তার প্রস্তাবিত ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিকত্বের সংজ্ঞাকে পুনর্নির্মাণ করেছেন, যা এনলাইটেনমেন্ট-উত্তর আধুনিক রাষ্ট্র থেকে পৃথক ধাঁচের। এখন হয়তো অনেকে বলবেন, এতে অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। এই পূর্বানুমান থেকে এটা কি ধরে নেওয়া সম্ভব, যারা বৈষম্যের শিকার বলে দাবি করা হয়, তারা কীভাবে বাস্তবে বৈষম্যটাকে অনুভব করে? এটা একটা বিকল্প উন্নততর ধারণাও হতে পারে।

তালাল হরে দরে প্রাক-আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র ধারণাকে খুব সংকুচিত করে দেখিয়েছেন। সে-সময় কি রাষ্ট্র ছিল না বা সেই রাষ্ট্রে আনুগত্যের প্রশ্ন কি কখনো ওঠেনি? গ্রিসের নগররাষ্ট্র বা মদিনায় রসুল স.-এর তৈরি নগররাষ্ট্র সম্বন্ধে কী বলা যায়? অথবা মুসলিম খেলাফত রাষ্ট্রকে? সে-সময়েও এক ধরনের রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল। হয়তো কাঠামোগতভাবে হুবহু আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধরনের নয়। নাগরিকত্বের ধারণা, আনুগত্যের ধারণা একচেটিয়া আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ব্যাপার— এটা সব সময় বলা যায় কি?

তালাল আসাদের আরেকটা পর্যবেক্ষণ হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। তার মতে, রাষ্ট্র হলো মানুষের হাতে তৈরি— আল্লাহর সৃষ্টির সৃষ্টি। সুতরাং, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ভেতরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চিহ্নিত করা মানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সমতুল্য করে তোলা। তাই মুহম্মদ আসাদের কথা মতো ইসলামি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য— এই দাবি রীতিমতো শিরক— ধর্মবিরোধী, ধর্ম অবমাননার পর্যায়ভুক্ত। এই যুক্তির ব্যাপারে তালাল ধর্মরাষ্ট্রপন্থিদের কথা উদ্ধৃত করেছেন :

> ততক্ষণ পর্যন্ত একজন শাসকের আনুগত্য করা যাবে, যতক্ষণ সে আল্লাহর আইনের ওপর অনুগত থাকে এবং তা যথাযথভাবে নাগরিকদের ওপর প্রয়োগ করে।

কিন্তু এখানেও তালালের প্রশ্ন— এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ কীভাবে হবে? সেক্ষেত্রে উত্তরটা তিনি নিজের মতো করে দিয়েছেন। আধুনিক রাষ্ট্র বা তার অনুগত প্রতিষ্ঠানসমূহ করবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রই পরম

কর্তৃত্বের অধিকারী হলো। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম হাজিরা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। রাষ্ট্রের প্রতি এই পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণকে রাষ্ট্রপূজা বা Negative Political Theology হিসেবে তালাল সাব্যস্ত করেছেন। তার কথা ধার করছি :

> It is therefore not entirely clear to me why my father should have assumed the right of the Islamic state—as a modern state—to claim absolute loyalty, and use that as a basis for distinguishing between its Muslim and non-Muslim subjects.[৪৪]
>
> [সুতরাং, আমার কাছে এটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয় যে, আমার পিতা কেন একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামিক রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করার অধিকার গ্রহণ করেছিলেন এবং এটাকে তার মুসলিম ও অমুসলিম প্রজাদের মধ্যে পার্থক্য করার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।]

তালাল আসাদ আরো উল্লেখ করেন, আমর বিল মারুফ— কুরআনের এই ধারণাকে অনেকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। তার কথা হলো, এই ধারণা প্রয়োগে রাষ্ট্র বা কোনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তিনি জরুরত মনে করেন না।

তালাল যেভাবে পূর্বানুমানভিত্তিক ধরে নেন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সাংঘর্ষিক— এই বাইনারিটা পশ্চিমের জাতিরাষ্ট্রকে সামনে রেখে টানা যেতে পারে। তবে ইসলামি রাষ্ট্রকে সামনে রেখে এ ধরনের আলাপ যুক্তিসঙ্গত হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে কোনো বাইনারি থাকে না।

ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে পশ্চিমা আধুনিক রাষ্ট্রের একটা মস্তবড়ো তফাতের জায়গা হলো আইন প্রণয়নের স্বত্তাধিকারের জায়গাটা। আধুনিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করে জনগণের প্রতিনিধি পার্লামেন্টে। পার্লামেন্ট এখানে সার্বভৌম। ইসলামি রাষ্ট্রে কুরআন-হাদিসের আইন অথবা ওই নীতি ধরে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। পার্লামেন্ট সেটাকে কার্যকর করার পথ বাৎলে দেয়। ইসলামি রাষ্ট্রে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করার

ক্ষমতা সীমিত। পার্লামেন্ট এখানে সার্বভৌম নয়। রাষ্ট্র বা তার শাসক আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে নাগরিকদের দেখভাল করে। আইনের এই তফাতের কারণে রাষ্ট্র, শাসক, শাসক-রাষ্ট্রের সম্পর্ক, নাগরিক, নাগরিক-রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাজনৈতিক দল, ভোটাধিকার, জবাবদিহিতা— সব কিছুর সংজ্ঞাই পাল্টে যায়। তালাল ইসলামি রাষ্ট্রের এই কাঠামোটা তলিয়ে দেখেননি।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম খেলাফত। ইসলামের ইতিহাসে খেলাফতের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। আজো মুসলিম মন জুড়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হারিয়ে যায়নি। কারণ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব দুনিয়াজুড়ে বিস্তৃত। আজকের জাতিরাষ্ট্রের বাস্তবতায় এই কাঠামোর ভেতরে ইসলামি নীতি-নৈতিকতা, বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে বটে, একই সাথে বৃহত্তর খেলাফত প্রতিষ্ঠার সাথে এসব রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও বিরাজ করে। ইসলামের ইতিহাসে খেলাফতের যে বিচিত্র, বর্ণিল ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা— তার আলোকে তালাল কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত। মুসলমানের কাছে এটাই শেষ কথা। রাষ্ট্রনৈতিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবি এই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার একটা অংশ। রাষ্ট্র যত বড়ো হোক, শেষ পর্যন্ত এটা একটা সীমাবদ্ধ কাঠামো। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কোনো সীমারেখায় বন্দী করা যায় না। আর মুসলমানরাও আল্লাহ ছাড়া কোনো কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানকে সার্বভৌম মনে করে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কেউ অস্বীকার করলেও তাতে তার কিছু আসে যায় না।

ইসলামের হুকুম বলবত করার জন্যই রাষ্ট্র দরকার। রাষ্ট্র ছাড়া ইসলামের নীতি ধরে মুসলমানরা কীভাবে তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে উদযাপন করবে? খেলাফত নেই। জাতিরাষ্ট্র এসেছে। মুসলমানদের স্বকীয়তা নিয়ে বাঁচবার জন্য তাই বারবার ব্যবহার উপযোগী সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছে। মুহম্মদ আসাদ বলেছেন, যুগের আলোকে সেই কাঠামোকে নতুন নতুনভাবে বাছাই করা সম্ভব। যদি যুক্তির খাতিরে তালালের কথা সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্রের ওপর ভর করতে হয়, তবে মর্মের দিক থেকে সেটা অবশ্যই ভিন্ন।

রাষ্ট্রকাঠামো কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। এটা বদলায়। এ প্রসঙ্গে তালালের বন্ধু ও সহযোগী ওয়ায়েল হাল্লাকের নজির টানা যায়। তিনিও ইসলামি রাষ্ট্র প্রসঙ্গে তালালের মতোই যুক্তি দেন— এটা অসম্ভব ব্যাপার। তার লেখা *Impossible State* তো এখন ইসলামবাদী রাজনীতি যাদের অপছন্দ, তাদের কাছে রীতিমতো বাইবেল।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় ইসলামবাদী রাজনীতির কথা যারা বলেছেন, তারা আধুনিক রাষ্ট্রের বাইরে নানা বিকল্প নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। সেখানে তারা যেমন আধুনিক রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তেমনি আধুনিকতার কিছু দিককে গ্রহণ বা বর্জন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিকতার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। আধুনিকতা বা আধুনিক রাষ্ট্র প্রকল্পের সাথে ইসলামবাদীদের এই নানারকম বোঝাপড়ার সাথে তালাল বা হাল্লাক কেউই যথাযথভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেননি।

তালাল তার পিতাকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটির শেষাংশে রাষ্ট্র নির্মাণ বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনকে লক্ষ্য না বানিয়ে এক ইসলামি নৈতিকতাভিত্তিক রাজনীতি গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলতে চান তার পিতার লেখালেখিতে এই ধরনের ভাবনাচিন্তা লুকায়িত (implicit) আছে। তালাল এ ধরনের কথা আরো দুয়েক জায়গায় বলেছেন। যেমন— ফাদি বারবাদিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে[৩৫] তিনি বলেছেন, ইসলামপন্থি রাজনীতি বলে কিছু থাকা উচিত নয়। তাদের যদি রাজনীতি করতে হয়, তবে রাষ্ট্রক্ষমতা বা রাষ্ট্র চালানোর চিন্তা বাদ দিয়ে ইসলামি নৈতিকতাভিত্তিক কিছু করা উচিত। ইসলামকে তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কিংবা মুক্তিকামী রাজনীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে রাজি নন। তিনি ইসলামকে বড়োজোর একগুচ্ছ নৈতিক গুণের সমষ্টি হিসেবে দেখতে আগ্রহী।

তালাল পিতাকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধে কিছুটা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে লিখেছেন, তার পিতা তাকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাতেন, যেখানে ভোগবাদিতা ও লোভলালসা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি করা হয়েছে। এই লোভলালসা যেমন পরকালে আমাদের দোজখে নিক্ষেপ করে, তেমনি এই দুনিয়াকেও দোজখ বানিয়ে ফেলে।

তালালের পিতা তাকে বলতেন, লোভ ও ভোগ আমাদের সামষ্টিক জীবন ও ব্যক্তিজীবন উভয়কে কলুষিত করে। এর ফল হয় ধনী-গরিবের বৈষম্য, ব্যক্তিগত জীবনে প্রদর্শনপ্রিয়তা ও বিলাসিতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের ধ্বংস এবং পারমাণবিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়। এই ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বাধীনতা কিন্তু বৈশ্বিক পুঁজিবাদের চক্রে বন্দী হয়। ভোগবাদিতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সেবা দেয়। তাই, তালালের কথা হলো— ধর্মীয় রাষ্ট্র দিয়ে সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিস্থাপিত না করে, কোনো এক ভিন্ন পরিসরে ইসলামি রাজনীতিকে খুঁজতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে যেসব অ-ইসলামি আন্দোলন, যাদের নৈতিক বিবেচনা আছে, তালালের কথা হলো— এদের সাথে ইসলামি রাজনীতির মিত্রতা হতে পারে। ইসলামি রাজনীতির কাজ হচ্ছে মানুষের ভেতরে নৈতিকতার জাগরণ এবং নৈতিক ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে গড়ে তোলা। এই নৈতিক নির্মাণের পরিসরে জাতীয় সীমানার ভেতর ও বাইরে সব ধর্ম ও মতের মানুষের স্থান থাকবে বলে তালাল মনে করেন।

তালাল ইসলামের আমর বিল মারুফের ধারণাকে এই নৈতিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা হিসেবে দেখেন— ইসলামি রাষ্ট্র বা ক্ষমতাকেন্দ্রে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখেন না। তালাল এই ধরনের নৈতিকতার উৎস হিসেবে ঈমানের চেতনার কথা বলেন। তার ভাষায় এমবোডিড ডিসপোজিশন।

এ পর্যায়ে তালাল তার পিতার শুকুর আল-মুমিন ধারণার কথা বলেন। এই ধারণায় বলা হয়, আল্লাহ জগতের সব কিছু মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই, আল্লাহর প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ জগতের প্রতি মানুষের এক বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করে। এই সম্পর্কের কারণে মানুষ পরিবেশ-প্রকৃতি ও সম্পর্কের পণ্যকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ লড়াই তার খোদার প্রতি শুকরিয়ার এক নিদর্শন।

তালাল দেখান, জগতের প্রতি এই মুগ্ধতা কোনো মোহ (Enchantment) নয়। ম্যাক্স বেভার আধুনিকতার নিদর্শন হিসেবে মোহমুক্তি (Disenchantment)-এর কথা বলেছেন। বেভারের মতে

এই মুগ্ধতা বা মোহ যুক্তির প্রতিবন্ধক। তাই এই মুগ্ধতা থেকে মুক্তি না হলে আধুনিকতা দূরে থেকে যাবে। এই অর্থে শুকুর আল-মুমিন মুগ্ধতা নয়, জগতের প্রতি উদাসীনতার বদলে এক ধরনের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি এবং এই জগতের স্রষ্টার প্রতিও।

তালালের কথা হলো, ইসলামি রাজনীতির লক্ষ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়। ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম নয়। সম্প্রদায়ের একতার আত্মোপলব্ধির প্রতিনিধিত্বও নয়। বরং, নৈতিক চেতনার উদ্বোধন।

তালালের এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পর বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। ইসলামি রাজনীতি ছাড়া ইসলামি নীতিনির্ভর সমাজের যে কথা তিনি বলেছেন, তা কতটুকু বাস্তবসম্মত? তালাল নিজেই বলেছেন, আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী। এটা মানুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক যে নৈতিকতা, তা তছনছ করে দেয়। সেক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোকে পরিবর্তন না করে ইসলামি সমাজ নির্মাণ করা এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র। এ প্রবন্ধে তালাল ইসলামের নৈতিকতা ও রাজনীতিকে ভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ইসলাম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে ভাবতে হবে।[৪৬] কিন্তু এরকম বাইনারি ইসলামে নেই। শুধু তাই নয়, এ প্রবন্ধে তালাল এক ধরনের ইসলামের নি-রাজনীতিকরণের প্রস্তাব দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, তালাল সেকুলারিজমকে দুষেছেন এটা ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করে। অথচ তিনি নিজেই ইসলামি রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত ও সংকুচিত করার চেষ্টা করলেন।

তালালের সংজ্ঞায়িত ইসলাম অবশ্য সেকুলার মহলে খুবই জনপ্রিয়। কারণ, তারা ইসলামের রাজনৈতিক শক্তিকে মোকাবিলা করতে চান না। এ প্রবন্ধটি প্রকাশের পর কেউ কেউ বলেছেন, তালাল তার পিতার ওপর লেখালেখির সূত্রে সউদি রাজতান্ত্রিক ইসলামকে এক ধরনের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ মুহম্মদ আসাদ তা করেননি।

তালালের সংজ্ঞায়িত নি-রাজনীতিকৃত ইসলামের সাথে আজকালকার পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ায় আলোচিত ও উৎপাদিত পোস্ট-ইসলামিজম (উত্তর-ইসলামবাদ), পোস্ট-সেকুলারিজম (উত্তর-সেকুলারবাদ), পোস্ট-ইডিওলজি (উত্তর-মতাদর্শবাদ) প্রভৃতি প্রবণতার একটা পরোক্ষ

যোগাযোগ আছে। কারণ, এরা সবাই কোনো না কোনোভাবে নিও-লিবারেলিজমের (নব্য-উদারনীতিবাদ) স্বার্থ রক্ষা করে।

পোস্ট-ইসলামিজমের কথা হলো, ইসলামবাদী রাজনীতি ব্যর্থ হয়েছে। তাই এখন নতুন ধরনের আধুনিকতা ও সেকুলারিজম প্রয়োজন। এটা ধার্মিকতার সাথে অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণাকে সমন্বয় করে। আসিফ বয়েত, শাদি হামিদ, অলিভিয়ার রয়ের মতো ভাবুকরা এসব কথা প্রচার করেন।

পোস্ট-সেকুলারিজম হচ্ছে জনপরিসরে ধর্মের কণ্ঠস্বরকে কিছুটা জায়গা দেওয়া, ঐতিহ্যবাহী সেকুলারিজমের খুঁতকে নিরীক্ষা করা এবং জনপরিসরকে তুলনামূলকভাবে বহুত্ববাদী করে তোলা।

পোস্ট-ইডিওলজির উদ্দেশ্য হচ্ছে গতানুগতিক চিন্তার প্রবণতা, যেমন—উদারনৈতিকতা, সংরক্ষণশীলতা ও সমাজতন্ত্রের বাইরে একটা সমস্যা সমাধানের মতো বাস্তবমুখী রাজনীতির বয়ান তৈরি করা।

নিও-লিবারেলিজম হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপ, ব্যক্তি মালিকানা এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজি ও বাণিজ্যের প্রসার।

এসব চিন্তা ও প্রবণতাগুলোর প্রয়োজন হলো কেন? সহজ ভাষায় পশ্চিমকে প্রধান করে রাখাই এসব প্রবণতার উদ্দেশ্য। লিবারেলিজম ও সেকুলারিজমের ধারণা এতকাল পৃথিবী জুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। তত্ত্বগতভাবে এটা ব্যবহার করে পশ্চিম সারা দুনিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এর সাথে সাথে লিবারেলিজম ও সেকুলারিজমের সংকটটাও বেরিয়ে এসেছে এবং এটা দিয়ে আগের মতো পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে উঠেছে। এ কারণেই পশ্চিম লিবারেলিজমকে নতুন মুখোশ পরিয়ে মঞ্চে হাজির করেছে। এটাই নিও-লিবারেলিজম। অন্যদিকে ইসলামের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রকে প্রশমিত করে এর একটা কোমল চেহারা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটাই পোস্ট-ইসলামিজম। এভাবেই নিও-লিবারেলিজম পোস্ট-ইসলামিজম, পোস্ট-সেকুলারিজম, পোস্ট-ইডিওলজি প্রভৃতি প্রবণতাগুলোকে এক আকাশের নিচে জায়গা করে দিয়েছে। তালালের লেখালেখি ও চিন্তাভাবনা এসব প্রবণতাগুলোকে পরোক্ষভাবে হলেও শক্তি জোগায়, কখনো কখনো নির্মাণে ভূমিকা রাখে।

এবার আমরা তালাল আসাদকে একটু ভিন্নভাবে পাঠ করার চেষ্টা করবো। কেন তার মতো একজন অ্যাকাডেমিয়া কাঁপানো প্রভাবশালী নৃতাত্ত্বিক-পণ্ডিত তার বিশ্ববিশ্রুত ইসলামবিদ-পণ্ডিত পিতার রাজনৈতিক অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়ালেন? অথবা, যদি এভাবে বলা যায়, কেন মুহম্মদ আসাদ তার পুত্র তালালকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি? এর কি কোনো আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, এমনকি মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে?

আমরা দেখেছি, তালালের আব্বা-আম্মা একসময় আলাদা হয়ে যান। সাধারণত, এসব ঘটনার পিছনে একটা দুঃখজনক পটভূমি থাকে। সে পটভূমিটাই একসময় পৃথক হওয়ার পথ খোলাসা করে। তালাল এক জায়গায় বলেছেন, তার আম্মা ব্যথাতুর মনে মদিনায় তার পরিবারের কাছে চলে যান। এ ব্যথা কি তালালের মনে বেজেছিল? সাধারণত, এসব ঘটনা সন্তানের মনস্তাত্ত্বিকতার ওপর প্রভাব ফেলে। হয়তো এ কারণেই দেখা যায় তালালের আব্বার ব্যাপারে তার এক ধরনের মননশীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিরাগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে আম্মার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক ধরনের অতি আবেগের জায়গা। তালাল নিজেই বলেছেন, তার আব্বার ইসলাম ছিল বুদ্ধিবৃত্তির ইসলাম। আম্মার ইসলাম ছিল জীবনযাপনের তরিকা। তালাল আম্মারটা গ্রহণ করেছেন, আব্বারটা করেননি। অন্যদিক থেকে বললে, একজন নৃতাত্ত্বিকের স্বভাব অনুযায়ী জীবনযাপনের ইসলামকে তালাল গ্রহণ করেছেন। এভাবে নৃতাত্ত্বিকতার সাথে মায়ের প্রতি সন্তানের আবেগ অবচেতনে একাকার হয়ে গেছে। বড়ো মানুষের জীবনে অনেক সময় অনেক বড়ো ট্র্যাজেডি থাকে। তালাল ও তার আব্বা কেউই এই ট্র্যাজেডির বেদনাকে উৎরাতে পারেননি।

তালালের চিন্তার ভিত্তিটা দাঁড়িয়ে আছে প্রধানত পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের ওপর। এ কারণে তালাল রাষ্ট্রচিন্তার যে ধারণা দেন, তাতে এই অনুমান করা স্বাভাবিক— ইউরোপীয় রাষ্ট্রই তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে এবং এটাই দুনিয়ার ভবিতব্য, যেন এই রাষ্ট্র আর বদলানো যাবে না। অ-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তার কাছে হয়ে ওঠে অ-প্রধান। এই পটভূমিতে রাষ্ট্রচিন্তার জায়গা থেকে তিনি তার পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী

বানান। ইউরোপের ইতিহাস, ইউরোপের ধর্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাসের ভেতরকার বিবর্তন, জার্নি, মোলাকাত ও মোকাবিলা নিয়ে তিনি যে গভীর পাঠ করেছেন, সে তুলনায় ইসলাম নিয়ে তার পাঠ বেশ অপ্রতুল। ইসলাম নিয়ে এ পাঠের অসমতার কারণেই তালাল ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে সুবিচার করতে পারেননি।

তালাল সারাজীবন তত্ত্ব ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন। কম-বেশি প্রতিটি তত্ত্বের ব্যাপারে তিনি সংশয়ী। তার এই সহজাত সংশয়ী প্রবণতার কারণে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের বয়ানকে সমালোচনা করেছেন। উপরে বর্ণিত কারণগুলোর ভেতরে কোনটা প্রধান, আর কোনটা অ-প্রধান, এটা সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা হয়তো কঠিন। তবে ধারণা করতে পারি— সবগুলো কারণ একাকার হয়ে তালালের ভেতরে ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে এক ধরনের উদাসীনতা তৈরি করেছে।

এখন আমরা তালাল আসাদকে তার আব্বার চিন্তাভাবনার সাপেক্ষে একটু পর্যালোচনা করে দেখবো। তালালের আব্বা মুহম্মদ আসাদ ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামকে ঘিরেই তার চিন্তা ও তৎপরতাকে সাজিয়েছেন। এদিক দিয়ে তিনি ইসলামের ঘরের লোকে পরিণত হয়েছেন। আধুনিক ইসলামের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আসাদ পাশ্চাত্যকে সমালোচনা করেছেন ইসলামের বিশ্ববীক্ষার জায়গা থেকে। বিশ্ববীক্ষার জায়গা থেকে ইসলামের জগৎ যে পশ্চিমের ভাববিশ্ব থেকে পৃথক— এ নিয়ে তার টনটনে জ্ঞান ছিল। ইসলামের জায়গা থেকে তিনি হাজির করেছিলেন জীবনসমস্যার এক সমাধান এবং সেই সমাধানকে ঘিরে তিনি এক দিকনির্দেশনা প্রস্তুত করেছিলেন। ঐশী কিতাবের আলো দিয়ে তিনি আধুনিকতা ও পুঁজিবাদের কাঠামো দিয়ে তৈরি বিশ্বব্যবস্থার বাইরে এক নতুন বিশ্বের স্বপ্ন তৈরি করেছিলেন। তিনি একজন মুমিন। তার লেখালেখি, চিন্তাভাবনার মধ্যে আমরা সেই স্পষ্টতা দেখতে পাই। তিনি ঘুরিয়ে কথা বলেন না। যা বলেন, সরাসরি বলেন— যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি আমাদের বাতিঘর।

তালাল বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী। কিন্তু তার এই নৃবিদ্যার পটভূমি পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞানতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে তিনি ধর্ম,

বিশেষ করে ইসলামকে পর্যালোচনা করেন। সেদিক দিয়ে ইসলামের জায়গা থেকে তিনি একজন আউটসাইডার— বহিরাগত। তিনি কখনো ইসলামের বর্তমান লড়াই-সংগ্রামের অংশ হননি। তালাল তত্ত্বকে, চিন্তাকে, বয়ানকে সমস্যায়িত করেন। প্রশ্ন করেন, ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করেন। সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পছন্দ করেন। কখনো কখনো মনে হয়, তিনি তত্ত্বক্রীড়ায় মেতে উঠেছেন। তিনি একজন নিপুণ তত্ত্বক্রীড়াবিদ। যে-কোনো বাইনারিকে, সারবাদী চিন্তাকে প্রয়োজনে সমস্যায় ফেলেন। নেতিবাচকতা ও সংশয়ীপনা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা কাঠামোর সমালোচনা করেন, কিন্তু সেই কাঠামোকে ছাড়িয়ে যেতে চান না। হয়তো সেই কাঠামোকে ভবিতব্য হিসেবেও ধরে নেন। তালাল একজন যথার্থ অ্যাকাডেমিশিয়ান। অ্যাকাডেমিয়ার পরিসরেই তাকে মানায়। অ্যাকাডেমিয়ার বাইরে এনে তাকে বোঝাপড়া করতে যাওয়া মুসিবতের বিষয়। তিনি প্রশ্ন করতে পারেন, সমাধান দিতে পারেন না। বুদ্ধিজীবী হিসেবে এটা তার সীমাবদ্ধতা। তিনি বাতিঘর হতে পারেননি।

দশ.

তালালকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এ আলোচনা থেকে তালালের সাথে আব্বা মুহম্মদ আসাদের কোনো মিল কি আমরা দেখতে পাই? নাকি সবই অমিলে ভরা? মুহম্মদ আসাদ আমাদের ইতিহাসের অংশ। তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। ইতিহাসের স্রোতের বাইরে থাকা তালালের কাছ থেকে আমরা কিছু পেতে পারি কিনা, সেটাই এখন আমাদের আলোচনার অংশ।

মুহম্মদ আসাদ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলেছেন দাজ্জাল। অনেকেই পশ্চিমা সভ্যতার বিস্তর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতাকে নিয়ে এরকম আলাপ আসাদ ছাড়া কেউ করেনি। আসাদের মতে দাজ্জালের সব বৈশিষ্ট্য পশ্চিমা সভ্যতার ভেতরে আছে। দাজ্জাল একচোখা। পশ্চিমা সভ্যতাও তাই। এই সভ্যতা কেবলমাত্র জীবন ও জগতের

বস্তুগত মাত্রাটাকেই দেখে। এই কারণে এটা একচোখা। তার মতে, দাজ্জালের দ্রুত স্থানান্তরের ক্ষমতা আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুতগতিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। মুহম্মদ আসাদ তাই এই দাজ্জালি সভ্যতাকে বদলে ফেলার পক্ষপাতী।

তালাল পশ্চিমা সভ্যতাকে বদলাতে চান না। তিনি বরং এর স্থিতাবস্থাকে একপ্রকার মেনে নিয়েছেন। এটাকে পাল্টানো সম্ভব কিনা সে সম্পর্কেও তিনি সন্দিহান। তবে তালাল পশ্চিমা সভ্যতার ভেতরের একজন হয়ে এর ঐতিহাসিক জার্নিটা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পশ্চিম কীভাবে পশ্চিম হয়ে উঠল— এর প্রত্যেকটি স্তর তিনি ধরে ধরে দেখেছেন। এই ধরে দেখার সূত্রে তিনি পশ্চিমা সভ্যতার খুঁত, ত্রুটি, অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতাকে নিখুঁতভাবে শনাক্ত করেন। পশ্চিমা সভ্যতা মানে খুঁতবিহীন— এমন একটা ধারণা, যা আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে— পশ্চিমের সেই ছবিটা তিনি ঝাপসা করে দিয়েছেন। মুহম্মদ আসাদ যখন পশ্চিমা সভ্যতাকে সমালোচনা করেছেন, তখন সেটাকে ইসলামি ঘটনা বলে সহজে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তালাল যখন আধুনিকতার কাঠামোর ভেতরে থেকে আধুনিকতার ব্যবচ্ছেদ করেছেন, তখন সেটা নাড়ানো সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, সেটা পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমকে বোঝাপড়ার জন্য তালাল একজন শক্তিশালী পণ্ডিত। তিনি অ্যাকাডেমিয়াতে উঁচু মাপের সমালোচক হিসেবে স্বীকৃত। যারা পশ্চিমা ব্যবস্থার বাইরে বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছেন বা নাড়াচাড়া করছেন, তাদের জন্য তালালের সমালোচনার ধারা অনেকখানি কাজে আসতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমের আধুনিক ও সেকুলার প্রবণতাগুলো আফ্রো-এশিয়ার বহু দেশে তেমন কোনো ভালো ফল দেয়নি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সেকুলার প্রবণতাগুলো এসব দেশের জনগোষ্ঠীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অপর বানিয়েছে। সেকুলারিজম এসব দেশে কোনো রকমের জাতীয় ঐক্য তৈরি করতে পারেনি। বহু ক্ষেত্রেই সেকুলারিজম দেশের ভেতরে দ্বন্দ্ব-সহিংসতার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিম তার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে এসব দেশে সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার দিক

দিয়ে একদল তাঁবেদার শ্রেণি তৈরি করেছে। মাইনরিটি হয়েও এরা খুব শক্তিশালী। এ কারণে তারা মেজরিটির ওপরে পশ্চিমের মূল্যবোধ নির্বিচারে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহী। পশ্চিম সম্পর্কে এরা কোনো যৌক্তিক পর্যালোচনা করতেও রাজি নয়। তালালের লেখাজোখা এদের চোখ খুলে দিতে পারে। পশ্চিমকে বোঝাপড়ার কাজে উপকারী হতে পারেন এ ধারার আরো কয়েকজন পণ্ডিত— মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাঈদ, সাবা মাহমুদ।

কিন্তু ইসলামকে বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে মুহম্মদ আসাদ যেমন প্রাসঙ্গিক, পুত্র তালাল পিতার সেই জায়গায় ঠিক আসতে পারেননি। কারণ, তালাল প্রধানত পশ্চিমের জ্ঞানকাঠামো ব্যবহার করে ইসলামকে পর্যালোচনা করেছেন। ইসলামের চোখ দিয়ে ইসলামের সাথে তিনি বোঝাপড়া করেননি। তার বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার ভেতরে উত্তর-কাঠামোবাদী, উত্তর-আধুনিকতাবাদী, উত্তর-ইসলামবাদী, উত্তর-মতাদর্শবাদী প্রবণতাগুলো রয়েছে। এর ফলে ধর্মসহ যে-কোনো মতাদর্শিক বয়ানকে তিনি ভাঙ্গতে পছন্দ করেন। যে-কোনো তত্ত্বকে ধ্বসানো তার মুখ্য প্রবণতা। তার ভেতরে ভেঙ্গে আবার গড়ার প্রবণতা নেই। সুতরাং, তালালকে সাথে নিয়ে ইসলামকে পাঠ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন।

২০২৪ সালের রক্তাক্ত পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তালাল কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। যদিও তিনি পুরোপুরি অ্যাকাডেমিয়ার মানুষ, কিন্তু তার উত্তর-মার্কসবাদী, উত্তর-কাঠামোবাদী, উত্তর-ইসলামবাদী চিন্তাভাবনাকে এদেশে কেউ কেউ রাজনীতির জায়গায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে মিত্রতা করে উত্তর-মার্কসবাদী সেকুলাররা তালালের চিন্তাভাবনাকে তত্ত্বায়ন করে এক ধরনের রাজনীতি গড়ে তোলার কথা বলছেন। এর গালভরা নাম দিয়েছেন অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি। এরা বেশ কিছুদিন ধরে তালাল চর্চা করেছেন। এসব বাঙালি মার্কসবাদী বা সেকুলাররা দেখেছেন মার্কসবাদ ও সেকুলারিজম একটা সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে গত শতকে মার্কসবাদের পতনের পর এবং তৎপরবর্তী

মুসলিম জগতে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী তৎপরতার মুখে এ সংকট গভীরতর হয়েছে। এর ওপর নাস্তিকতার বদনাম তো আছেই। মার্কসবাদীরা অহরহ গণ শব্দটা ব্যবহার করে। কিন্তু পরিহাস হলো, এ শব্দটা তারা যত বেশি ব্যবহার করেছে, তত তারা বাস্তবে গণবিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নতুন পরিস্থিতিতে এরা ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের সাথে বোঝাপড়া শুরু করেছে। কিন্তু মার্কসবাদ বা সেকুলারিজমের মৌল ভাবনার সাথে এদের কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি। এরা এসব ব্যবস্থার ভেতরে শুধু সংস্কারের ভাবনা নিয়েছে। এরকম সংস্কারের প্রস্তাব পশ্চিমে হেবারমাস, জিজেক, বাদিউর মতো পণ্ডিতরা অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন। এদেরকে বলা যায় সংস্কারপছন্দ বাঙালি মার্কসবাদী বা সেকুলারবাদী। এরা ইসলামকে আর আগের মতো ইসলামোফোবিয়ার লেন্সে না দেখে, ইসলামবান্ধব একটি চেহারায় দেখতে চাচ্ছে। এই নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হিসেবে তারা গ্রহণ করেছে তালাল আসাদকে। তালালের ধর্ম ও সেকুলারিজমের বাইনারি ভাঙ্গা ও ট্র্যাডিশনকে মুক্তভাবে গ্রহণের চিন্তাধারাটা এদের রাজনীতির জন্য খুব সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। ধর্ম ও সেকুলারিজমের বাইনারি ভাঙ্গার কথা বলে তারা একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলছে, যেখানে ডান, বাম, মধ্যপন্থা সকলে একসাথে কাজ করতে পারে। এটাই গত কয়েক দশকে পশ্চিমে বেড়ে ওঠা নিও-লিবারেল অর্থনীতি ও রাজনীতির বাংলাদেশি সংস্করণ। এই নতুন রাজনীতিতে সেকুলারিজম থাকবে, জাতিরাষ্ট্র থাকবে, পশ্চিমের সিভিল ল থাকবে, বাজার অর্থনীতি থাকবে, কিন্তু পূর্বেকার উগ্র জাতিবাদী, ধর্মবিরোধী সেকুলারিজমের বদলে এক নমনীয়, শিথিল সেকুলারিজমের আবির্ভাব ঘটবে। সেকুলারিজমের খারাপ অংশটা বাদ দিয়ে এর একটা পবিত্র রূপ ফুটিয়ে তোলা হবে। এই নতুন নিও-লিবারেল সেকুলারিজমের আইকন হলেন তালাল আসাদ। তালাল এখানে কী চেয়েছেন সেটা বড়ো কথা নয়। এখানে তাকে এভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তালাল আসাদ তার বাইনারি তত্ত্ব ভাঙ্গার সূত্র খুঁজে পেয়েছেন খ্রিষ্টান ধর্মের ইতিহাসের ভেতরে। এখানে তিনি দেখান

খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে সেকুলারিজমের নানা রকমের মোলাকাত ও মোকাবিলা হয়েছে। এটা শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীতার জায়গা থেকে হয়নি, সমঝোতার জায়গা থেকেও হয়েছে। এটার ভেতরে যেমন পরম্পরা আছে, তেমনি ছেদও আছে। কখনো কখনো একটা আরেকটাকে জড়িয়ে আছে।

সেকুলারিজম ইসলামের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়নি। তাই একটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই বাইনারি ভাঙ্গার ব্যাপারটা অনেকখানি অসঙ্গত মনে হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশের সেকুলারিজমে একটা কলকাতা বা ভারতকেন্দ্রিক মাত্রা আছে। এই মাত্রাটা শুধু রাজনৈতিক নয়— সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সভ্যতাগত দ্বন্দ্বের বিষয়ও। এই বাইনারি ভাঙ্গা কতটা সহজ বা বাস্তব, সেটা ভাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বাইনারি জীবনের অংশ। জীবনের প্রয়োজনে মানুষ বাইনারি তৈরি করে, বাইনারি ভাঙ্গে, বাইনারিকে অতিক্রম করে। তওহিদ-শিরক, জালিম-মজলুমের মতো বাইনারি খুবই মৌলিক। একে ভাঙ্গা যায় না। সমাজে দ্বন্দ্ব থাকে। আবার দ্বন্দ্ব মিত্রতায় পরিণত হয়। এভাবে জীবন চলে। সর্বজনীনভাবে বাইনারি ভাঙ্গার ধারণাটা কতকটা ইউটোপিয়ান মনে হয়।

এবার ট্র্যাডিশন নিয়ে কিছুটা আলাপ করা যাক। ইসলামে ট্র্যাডিশন আছে, মার্জিনও আছে। এই মার্জিন নির্ধারিত হয় ইসলামের মূল ভিত্তি কুরআন-হাদিস দিয়ে। কেউ ইচ্ছা করলেই এই মার্জিনকে কম-বেশি করতে পারে না। এখন বাংলাদেশে চেহারা বদলানো উত্তর-মার্কসবাদীরা বাংলার ভাব, ফকিরি, মাজার, লালন, চৈতন্যের ট্র্যাডিশনকে ইসলামের মার্জিনের ভেতরে নিয়ে এসে একেও ইসলামি ঐতিহ্য বলার কোশেশ করছে। আরব ইসলাম, ইরানি ইসলাম, বাংলার ইসলাম— এভাবে ইসলামের একটা স্থানীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ইসলামের এরকম স্থানীয় পরিচয় হয় না। একদিকে পরিচয়বাদী রাজনীতি নিয়ে উন্নাসিকতা চলছে, অন্যদিকে সেই পরিচয়ের আধারে ইসলামের এক নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। বাংলার ইসলাম বলে এক নতুন ইসলাম বানিয়ে তার মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের

এজেন্সিকে সঙ্কুচিত করে সাম্রাজ্যবাদের নিও-লিবারেল রাজনীতির পথকে খোলাসা করা।

চিন্তাগতভাবে সংশয়ী হলেও তালালের লেখালেখির নিবিড় পাঠে অনুমান করা যায়, মায়ের সালাফি ইসলামের প্রতি তার এক ধরনের নীরব সম্মতি ছিল। সালাফি ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুফি ইসলামের আচারকে নেতিবাচকভাবে দেখা। কিন্তু বাংলাদেশের তালালবাদীদের প্যারাডক্স হচ্ছে এরা এখন সুফি ইসলামের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক ইসলামকে মোকাবিলার জন্য এরা সুফি ইসলামের গ্রাহক হয়েছে। নিও-লিবারেলিজমের রাজনীতির মহিমা ছাড়া আর কি! অথচ এই বদলে যাওয়া উত্তর-মার্কসবাদীরা একসময় সুফি ইসলামকে লক্ষ্য করে আস্ত ইসলামটাকে মোকাবিলা করত। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর *লাল সালু* উপন্যাস তার বড়ো প্রমাণ।

এসব নিয়ে তালালের অবস্থান জানা যায় না। তবে তার ট্র্যাডিশন ও ফরম অভ লাইফ বিষয়ক লেখা ও আলাপচারিতার সূত্রে কিছু সংশয় ও ছেদ তৈরি হয় বৈকি। সে-সবের সূত্রে বাঙালি উত্তর-মার্কসবাদীরা এসব আলাপের সুযোগ পেয়েছে। তালাল পুরোদস্তুর অ্যাকাডেমিয়ার মানুষ। অ্যাকাডেমিয়াই তার যথার্থ জায়গা। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাকে টেনে আনার কারণ তিনি ইসলামবাদী রাজনীতিকে অপছন্দ করেন। আমাদের দেশের উত্তর-ইসলামবাদী, উত্তর-মার্কসবাদী সেকুলাররা রাজনৈতিক মতলবেই এ কাজটা করেছে। আর একটা কারণ, তিনি মুহম্মদ আসাদের পুত্র। তাই পুত্রকে দিয়ে পিতার রাজনীতির এজেন্সিকে দুর্বল করার একটা অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা এদের থাকতেই পারে। যেমন— এদেশে মওদূদীর পুত্রকে দিয়ে মওদূদীর রাজনীতিকে অপ্রাসঙ্গিক করার চেষ্টারও নজির আছে। শেষ কারণটি হলো— এদেশে নিও-লিবারেল রাজনীতি-সংস্কৃতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তালালের মতো কাল্ট ফিগার দরকার। তালালকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করলে তিনি অহেতুক বিতর্কিত হয়ে উঠবেন। সেটা কারোই কাম্য নয়।

তালাল সারাজীবন কাটিয়েছেন তর্ক করে, সন্দেহ করে, প্রশ্ন করে। তার লেখার গভীর পাঠ থেকে অনুমান করা যায়, তিনি লিবারেলিজমকে প্রশ্ন

করেছেন নিও-লিবারেলিজমকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য। তিনি হয়তো একটা মানবিক লিবারেলিজমের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি যে সময় অ্যাকাডেমিয়া কাঁপিয়েছেন, সেটা ছিল নিও-লিবারেলিজমের উত্থান পর্ব। এ-সময় আধুনিকতা, ধর্ম, সেকুলারিজম, মার্কসবাদ ইত্যাদি বড়ো বড়ো বর্গ নিয়ে পর্যালোচনামূলক উত্তর-আধুনিক আলাপগুলো শুরু হয়েছে। এটা তাকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই।

অনুমান করি, তালালের মতো নামজাদা পণ্ডিত আব্বা আসাদের মতো তার পাণ্ডিত্যকে যদি নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য নিবেদন করতেন, তবে অনেক ভালো কাজ হতো। তার পিতা মানুষের মুক্তির কথা ভেবে জীবন পার করেন। পুত্র তর্ক আর সন্দেহে তার সমস্ত বুদ্ধিজীবীতাকে ব্যয় করেন। এটাকে তালালের প্রতিভার কিছুটা অপচয়ই বলতে হবে। তালাল হলেন উঁচুমানের অ্যাকাডেমিক তার্কিক। পিতা আসাদ ছিলেন মানবমুক্তির সন্ধানী মুসাফির। ট্র্যাজেডি অনেক রকম হয়। তালালের জীবনকে কিছুটা ট্র্যাজেডির রূপায়ন বলতেই হবে।

বাংলাদেশে এখন রাজনীতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সে জায়গায় তালালের চিন্তা রাজনৈতিকভাবে কোনো কাজ দেবে না। বাংলাদেশ এতকাল পশ্চিমাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে রাজনীতি, তার শিকলে আটকা পড়েছিল। ২০২৪-এর পরিবর্তনের পর এটা এখন পশ্চিমাদের নিও-লিবারেল রাজনীতির খপ্পরে পড়েছে। এর ওপরে আছে চীন ও ভারতের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাব। বিশেষ করে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবল ও সর্বাত্মক। এই নানান কিসিমের প্রভাবের বাইরে এসে বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব জাতের পলিটি তৈরি করতে হবে। যে রাজনীতির উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ। এখন এই পলিটি নির্মাণে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমটা হলো বাঙালি মুসলমানের প্রধান ন্যারেটিভ ইসলামকেন্দ্রিক একটা আধুনিক ভাষ্য। এক্ষেত্রে তালালের আব্বা মুহম্মদ আসাদ আমাদের কিছুটা হলেও দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। দ্বিতীয়টি হলো, এ ভূখণ্ডে বাঙালি মুসলমানের হাজার বছরের ঐতিহাসিক জার্নি। ইসলামই প্রধানত বাঙালি মুসলমানের ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতির কাঠামো তৈরি করেছে। এর সাথে বাঙালি মুসলমানের একটা ভাষিক

সত্তা আছে। তবে এই সত্তাটিকে ইসলামি সত্তার অধস্তন রাখতে হবে। কারণ, বাঙালি হিন্দুরাও এই সত্তাটির সাধারণ উত্তরাধিকার দাবি করে, যদিও তারা বাঙালিদের জন্য কোনো রাষ্ট্র চায়নি। বাংলাদেশ প্রধানত বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক জার্নির ফসল।

এখন বাঙালি মুসলমানের এই সাংস্কৃতিক সত্তার ওপর বাংলাদেশের পলিটিকে দাঁড় করাতে হবে। এই পলিটি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। বাংলাদেশ একটা ক্ষুদ্র দেশ। এ ধরনের পলিটি নির্মাণ কঠিন কাজ। একমাত্র জনগণের ঐক্যই এই কঠিন কাজকে সহজতর করবে।

বাংলাদেশ এখন একটা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। সে একটা পলিটি নির্মাণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আশাবাদী— এ শুভক্ষণ আসবে।

হাদিস

১. মুহম্মদ আসাদ, *মক্কার পথ*। অনুবাদ : শাহেদ আলী, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৬২।

২. 'ওভামির আনজুমের সাথে সাক্ষাৎকার', *চিন্তার মুসিবত তালাল আসাদের বাতচিত*। সম্পাদনা : মোহাম্মদ আজম ও সাব্বির আজম, ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০২৩।

৩. 'ডেভিড স্কটের সাথে সাক্ষাৎকার', *চিন্তার মুসিবত তালাল আসাদের বাতচিত*।

৪. 'ফাদি বারবাদিলের সাথে সাক্ষাৎকার', *চিন্তার মুসিবত তালাল আসাদের বাতচিত*।

৫. Talal Asad, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1993, p. 29.

৬. 'ফাদি বারবাদিলের সাথে সাক্ষাৎকার'।

৭. Talal Asad, 'The Idea of an Anthropology of Islam'. *Qui Parle*, Vol. 17, No. 2. Spring/Summer 2009, pp. 1-30.

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. Talal Asad, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. p. 19.

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

১৮. Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford, California : Stanford University Press, 2003, p. 17.

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৩০. James K. A. Smith, 'Secularity, Religion, and the Politics of Ambiguity'. *Journal for Cultural and Religions Theory*, Vol. 6. No. 3. (Fall 2005), pp. 116-122.

৩১. Hadi Enayet, *Islam and Secularism in Post-Colonial Thought: A Cartography of Asadian Genealogies*. London: Palgrave Macmillan, 2017.

৩২. Talal Asad, *Secular Translations: Nation-State, Modern Self, and Calculative Reason*. New York: Columbia University Press, 2018, p. 2.

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৯. Talal Asad, *On Suicide Bombing*. New York: Columbia University Press, 2007.

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৪৩. Talal Asad, 'Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism' in *Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech* (Eds. Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler, Saba Mahmood). New York: Fordham University Press, 2013, p. 15.

৪৪. Talal Asad, 'Muhammad Asad between Religion and Politics'. *Journal of Islam and Science*, Vol. 10 (Summer 2012), No. 1.

৪৫. ফাদি বারবাদিলের সাথে সাক্ষাৎকার, *চিন্তার মুসিবত তালাল আসাদের বাতচিত*।

৪৬. প্রাগুক্ত।

Boier Somahar
Click here
to join our Telegram Channel

গ্রন্থঋণ

তালাল আসাদের লেখা

১. *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* (1993)

২. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* (2003)

৩. *On Suicide Bombing* (2007)

৪. *Secular Translations: Nation-State, Modern Self, and Calculative Reason* (2018)

৫. *পাশ্চাত্য ও সেক্যুলারবাদ প্রসঙ্গে*। মূল : তালাল আসাদ, ভাষান্তর : রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী (২০২২)

তালাল আসাদকে নিয়ে লেখা

১. Hadi Enayat, *Islam and Secularism in Post-Colonial Thought: A Cartography of Asadian Genealogies* (2017)

২. *Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors*, Edited by David Scott and Charles Hirschkind (2006)

৩. সলিমুল্লাহ খান, *আদম বোমা* (২০২১)

৪. *চিন্তার মুসিবত তালাল আসাদের বাতচিত*। গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : মোহাম্মদ আজম ও সাব্বির আজম (২০২৪)